সমাজ স্থির হয়ে নেই, নিরন্তর চলছে অর্থাৎ পরিবর্তিত হচ্ছে। সেই চলন্ত সমাজের কয়েকটি দিশা বা aspect সম্বন্ধে কিছু খাপছাড়া আলোচনা এই বইএ আছে। বাঙালী পাঠক আজকাল গল্প আর কবিতা ছাড়া অন্য বিষয়ও পড়েন। আশা করি 'চলচ্চিন্তা' নিতান্ত নীরস মনে হবে না।

— রাজশেখর বসু। আশ্বিন ১৮৮০।

'চলচ্চিন্তা' প্রথম সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয়, গ্রন্থের স্বল্পায়তন লক্ষ্য করিয়া লেখক তখনই পরবর্তী সংস্করণে আরও কিছু প্রবন্ধ যোগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পরে প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হইলে তখনও পর্যন্ত যতগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল সবগুলিই দ্বিতীয় মুদ্রণে সংযোজিত করিতে বলেন এবং সেই ভাবেই পাণ্ডুলিপি সাজাইয়া দেন। কারণ স্বরূপ বলেন, এই কয়টি প্রবন্ধে আর একটি স্বতন্ত্র বই হইবে না— আর বোধ হয় তাঁহার পক্ষে নূতন প্রবন্ধ লেখাও সম্ভব হইবে না। কথাটা এত শীঘ্র, এত মর্মান্তিক ভাবে সত্য হইবে তাহা আমরা কেহই ভাবি নাই। প্রেস-এ পাণ্ডুলিপি বুঝাইয়া দিবার কয়েকদিন পরেই উপর হইতে তাঁহার ডাক আসিল। গ্রন্থের এই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁহাকে দেখাইতে পারিলাম না, এইটিই বিশেষ দুঃখ রহিয়া গেল। এই সংস্করণে আটটি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থের মুদ্রণকার্য শেষ হওয়ার সময়ে পত্রিকান্তরে ১৮৪৯ শকাব্দে প্রকাশিত আরও দুটি প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া গেল। ঐ দুটি প্রবন্ধ ইতিপূর্বে অন্য কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। গ্রন্থশেষে পরিশিষ্ট অংশে উক্ত প্রবন্ধ দুটি যুক্ত হইল।

শ্রাবণ, ১৮৮২

—প্রকাশক

সূচী

আমাদের পরিচ্ছদ

সম্প্রতি জওহরলাল নেহরু এক বক্তৃতায় বলেছেন, ইওরোপীয় পোশাকের উপর এ দেশের লোকের অত্যন্ত ঝোঁক তিনি পছন্দ করেন না। কি রকম সাজ ভারতবাসীর উপযুক্ত তা তিনি খোলসা করে বলেন নি। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন তখন কাগজে তাঁর হ্যাট কোট টাই ট্রাউজার পরা ছবি বেরিয়েছিল। সম্প্রতি আমেরিকা ভ্রমণের ছবিতে তাঁর পরনে লংকোট টাই আর গান্ধীটুপি দেখা গেছে। ভারতবর্ষে তিনি চুড়িদার পাজামা আচকান আর গান্ধীটুপি পরে থাকেন। অতএব ধরে নিতে পারি সর্বাবস্থায় সাহেব সেজে থাকাই তাঁর অপছন্দ; ক্ষেত্র বিশেষে বিলাতী বা দেশী-বিলাতীর মিশ্র পোশাকে তাঁর সম্মতি আছে।

হিন্দীতে একটা প্রবাদ আছে যার মানে— নিজের রুচিতে খাবে আর পরের রুচিতে পরবে। নিজের রুচিতে সাজতে গেলে বাধা পাওয়া যায় তা আমি দেখেছি। একবার দরজীকে ফরমাশ করেছিলাম— আমার যে পঞ্জাবি করবে তার বুকের উপর বাঁ দিকে একটা মামুলী পকেট হবে, আর ভিতরে ডান দিকে আর একটা পকেট হবে; বাঁ দিকের পকেট বাইরে, আর ডান দিকেরটা ভিতরে। বুঝেছ? দরজী বলল, আজ্ঞে ঠিক বুঝেছি। যখন জামা তৈরী হয়ে এল তখন দেখলাম দুটো

পকেটই বাঁ দিকে, একটা বাইরে আর একটা ঠিক তার পিছনে ভিতর দিকে। বললাম, এ কি করেছ মিয়া? মিয়া উত্তর দিল, ছুটো ছু দিকে থাকলে যে বেপ্যাটান হবে বাবু, তা তো দস্তুর নয়। দরজী নিষ্ঠাবান লোক, দস্তুর ভঙ্গের পাতক থেকে আমাকে রক্ষার জন্য নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল। আর একবার পঞ্জাবির ফরমাশ দিয়েছিলাম যার বুক কোটের মতন সবটা খোলা যায়। দরজী এবারে আমার অনুরোধ রেখেছিল। কিন্তু শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা বলল, এ কি রকম বেয়াড়া জামা! এ যে কোটজাবি, না কোট না পঞ্জাবি, ফেলে দাও এটা। আমি ফেলি নি, ছু-তিন জন আমার দেখাদেখি কোটজাবি বানিয়েছিল।

সমস্ত ভারতের স্ত্রীপুরুষের পরিচ্ছদের আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কেবল বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথাই বলব, প্রথমে পুরুষের, শেষে মেয়ের। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমাদের রুচি তিন কারণে প্রভাবিত হয়—(১) গতানুগতিক রীতি, (২) সাময়িক ফ্যাশন হুজুগ বা বিখ্যাত লোকের আদর্শ এবং (৩) স্বাস্থ্য স্বাচ্ছন্দ্য বা সুবিধার জ্ঞান। তা ছাড়া আর্থিক কারণ বা সুলভতা ছুর্লভতা তো আছেই।

গতানুগতিক রীতি কালক্রমে বদলায়। আমার শৈশবে অর্থাৎ প্রায় সত্তর বৎসর আগে সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পরিচ্ছদ

ছিল ধুতি পিরান চাদর আর বিলাতী গড়নের জুতো (শু বা পম্প)। পিরানের আকার আধুনিক পঞ্জাবির মতন, কিন্তু ঝুল কম। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা পরতেন ধুতি, কোরতা বা খাটো আঙরাখা, চাদর আর চটি, অনেক সময় শুধু ধুতি চাদর চটি। কোরতার বোতামের বদলে ফিতা থাকত, ঝুল কোমর পর্যন্ত। খাটো আঙরাখার গড়ন চাপকানের মতন কিন্তু ঝুল নিতম্ব পর্যন্ত। কীর্তন-গায়করা এখনও কোরতা পরে থাকেন। গেঞ্জির চলন ৬০।৭০ বৎসর আগে হয়। সেকালে নাম ছিল গেঞ্জিফ্রক। ইংলাণ্ড আর ফ্রান্সের মাঝে যেসব দ্বীপ আছে তার একটার নাম Guernsey আর একটার Jersey। তা থেকেই জামার নাম গেঞ্জি আর জার্সি হয়েছে।

বিলাত-ফেরতরা তখন সর্বদা সাহেবী পোশাক পরতেন, সুরেন বাঁড়ুজ্যে এবং আরও দু-চার জন ছাড়া। উকিল ডেপুটি সবজজ আর বড় কর্মচারীরা ইজার চাপকানের উপর চোগা বা পাকানো চাদর পরতেন, মাথায় শামলা বা পিরালী পাগড়ি দিতেন। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালিতে আছে, মহেন্দ্র চাপকান পরে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে যেত। শীতকালে অবশ্য সকলেরই পোশাকের পরিবর্তন হত, মধ্যবিত্তরা ধুতির উপর গরম কোট এবং র‍্যাপার বা শাল পরতেন। অল্প কয়েক জন অতি সেকেলে লোক পারসী কোট (ঝুল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত) আর চায়না কোট (গলায় কলার নেই, ঢিলা গড়ন) পরতেন।

প্রায় ষাট বৎসর আগে অল্পবয়স্কদের মধ্যে পিরানের বদলে

শার্টের প্রচলন হল। শার্টের উপর চাদর বা উড়ুনি ইচ্ছাধীন, কিন্তু কলকাতার যুবসমাজে কোটের উপর চাদর পরা বাঙাল বা খোট্টা-বাঙালীর লক্ষণ গণ্য হত। ক্রমশ শিক্ষিত লোকের অনেকের হুঁশ হল, শার্ট হচ্ছে সাহেবদের অন্তরীয়, কোটের নীচে পরবার। তখন তার বদলে এল পঞ্জাবি, অর্থাৎ বেশী ঝুলওয়ালা পিরান। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালীর সাজ নিরূপিত হয়ে গেল— ধুতি আর পঞ্জাবি, তার উপর চাদর ইচ্ছাধীন। ধুতি-চাদর আমাদের বহু প্রাচীন পরিধেয়, কিন্তু 'পঞ্জাবি' নামেই বোঝা যায় এটি খাঁটী বাঙলা দেশের জিনিস নয়। পিরান শার্ট আর পঞ্জাব অঞ্চলের আজানুলম্বিত 'কমীজ'-এর মিশ্রণে পঞ্জাবি নামক জামার উৎপত্তি হয়েছে। ১৯২০-৩০ নাগাদ চাপকান চোগা শামলা পাগড়ি লোপ পেতে লাগল এবং সাহেবী সাজই সম্ভ্রান্ত পোশাক গণ্য হল, কিন্তু হ্যাট বহুপ্রচলিত হয় নি।

কাপড়ের দাম ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার ফলে বালক আর কিশোরদের মধ্যে হাফপ্যাণ্টের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। ধুতি পরা ছোট ছেলে এখন আর প্রায় দেখা যায় না, মেয়েরাও কিশোর বয়স পর্যন্ত ফ্রক পরে। যুবা আর প্রৌঢ়দের মধ্যে ধুতির বদলে পাজামা ইজার বা প্যাণ্টের প্রচলন ক্রমশ বাড়ছে। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বদেশী রুচি লুপ্তপ্রায় হয়েছে, এখন হরেক রকম ইজার প্যাণ্ট শার্ট কোট আর শার্ট-কোটের খিচুড়ি চলছে, অদূর ভবিষ্যতে বাঙালীর জাতীয় পরিচ্ছদ কি দাঁড়াবে বলা অসম্ভব।

গত সত্তর বৎসরে আমাদের পরিচ্ছদের যে ক্রমিক পরিবর্তন হয়েছে তার একটি কারণ নকল, ফ্যাশন বা হুজুগ, অন্য কারণ ধুতির মূল্যবৃদ্ধি। কি রকম পরিচ্ছদ আমাদের উপযুক্ত তা নূতন করে বিচারের পূর্বে কতকগুলি বিষয় মেনে নেওয়া যেতে পারে। যথা—

(১) সর্বাবস্থায় একই রকম পরিচ্ছদ চলতে পারে না, কর্মভেদে এবং ঋতুভেদে বেশের পরিবর্তন হবেই।

(২) ভারতের সকল প্রদেশের আবহাওয়া সমান নয়, সে কারণে পরিচ্ছদও সমান হতে পারে না। তথাপি সর্বভারতীয় মিলনের ক্ষেত্রে কিছু সাম্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৩) ইওরোপ আমেরিকার বিভিন্ন জাতির পরিচ্ছদে খুব মিল আছে। ইংরেজী যেমন বিশ্বরাজনীতির ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ইওরোপীয় পোশাকও তেমনি সর্বজাতির ভব্য পরিচ্ছদ হয়ে পড়েছে। ভারতবাসী যদি ইওরোপীয় পোশাক অল্লাধিক গ্রহণ করে তবে আপত্তির কারণ নেই। অবশ্য ইওরোপীয় পোশাকের সবটাই স্বাস্থ্যের অনুকূল আর সুবিধাজনক নয়, অনাবশ্যক উপকরণও তাতে আছে (যেমন নেকটাই), সে কারণে কিছু কিছু সংস্কার হওয়া উচিত।

ফ্যাশন অগ্রাহ্য করে শুধু স্বাস্থ্য আর সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে যদি বাঙালীর পরিধেয় নির্ধারণ করা যায় তবে তা কি রকম হবে? অনেক কাল আগে একজন মান্যগণ্য ইংরেজ (নাম মনে নেই) কয়েক বৎসর বাঙলা দেশে বাস করে বিলাতে রিপোর্ট

পাঠিয়েছিলেন— We are baked for four months, boiled for four months and allowed to cool for four months। এই বিবরণে অত্যুক্তি আছে, কিন্তু এ কথা ঠিক যে আমাদের মাতৃভূমি গ্রীষ্মকালে সর্বদা মলয়জশীতলা থাকে থাকে না, গুমট আর ভেপসা গরম দুইই আমাদের ভোগ করতে হয়। এ দেশের বাতাস পশ্চিম ভারতের মতন শুকনো নয়, সেজন্য তাপ প্রবল না হলেও ঘাম বেশী হয়। এখানে বসন্ত থেকে শরৎ পর্যন্ত প্রায় সাত মাস অল্পাধিক গরম, শীত ঋতুও মৃদু ও অল্পস্থায়ী। অতএব আমাদের পরিধেয় প্রধানত আর্দ্রোষ্ণ (humid and hot) বায়ুর উপযুক্ত হওয়া উচিত। অবশ্য শীতকালে পরিবর্তন করতে হবে।

আরব দেশের লোক গ্রীষ্মের তাপ রোধের জন্য সাদা কাপড়ের চোগা পরে, পুরুষরাও সাদা ঘোমটা দিয়ে মাথা আর মুখের দু পাশ ঢাকে। আমাদের দেশে গ্রীষ্মের দু-এক মাস খালি গায়ে আর খালি মাথায় বাইরে গেলে তাতের জন্য কষ্ট হয়, ছাতা বা আর কিছু দিয়ে মাথা ঢাকতে হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত সাত মাসের বাকী সময় বাতাস আর্দ্রোষ্ণ থাকে, তখন অল্প পরিচ্ছদই স্বাস্থ্যকর। ইওরোপীয় পুরুষ খালি গায়ে মোটরে চলেছে এই দৃশ্য এখন কলকাতায় বিরল নয়। আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অনেকে সেকালে যা পরতেন এবং এখনও যা পরেন— ধুতি চাদর আর চটি— এই হলেই যথেষ্ট। তাত অথবা অল্প ঠাণ্ডার সময় চাদর দিয়ে গা ঢাকা যেতে পারে,

ভেপসা গরমে চাদর কাঁধে রেখে গায়ে হাওয়া লাগানো যেতে পারে। কিন্তু মানুষের রুচি সকল ক্ষেত্রে যুক্তির বশে চলে না। ভারত সরকার আমাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, আমাদের ভব্যতার ধারণাও বদলাচ্ছে, আগে যা বিলাস গণ্য হত এখন তা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। শুধু ধুতি চাদর চটি এখন অচল, আমাদের গলা থেকে পা পর্যন্ত সবই ঢাকতে হবে।

ধুতির অনেক গুণ। সেলাই করতে হয় না, সহজে পরা যায়, সহজে খোলা যায়, গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে না, হাওয়া লাগতে দেয়, নিত্য কাচা যায়, ইস্তিরি না করলেও চলে। ধুতি শব্দের মূল রূপ ধৌতি, অর্থাৎ যা নিত্য ধৌত করতে হয়। আধুনিক ভদ্র বাঙালী যেভাবে ধুতি পরে তা নির্দোষ নয়। সামনে এক গোছা কোঁচা নিরর্থক, তাকে শুধু বোঝা বাড়ায় আর হাওয়া আটকায়। প্রমাণ ধুতি যদি দশ হাতের বদলে আট হাত করা হয় তবে লজ্জা নিবারণে কিছুমাত্র বাধা হয় না, শরীরে বেশী হাওয়া লাগে, কাপড়ের ওজন ১/৫ ভাগ কমে, দামও কমে।

বাঙালীর কোঁচা একটা সমস্যা, পথ চলবার সময় অনেকেই বাঁ হাতে কোঁচার নিম্নভাগ ধরে থাকে। সেকালের ভারতীয় সুন্দরীদের হাতে লীলাকমল থাকত, মধ্যযুগের রাজাবাদশাদের হাতে গোলাপ ফুল বা শিকারী বাজপাখি থাকত, ভিকটোরীয় যুগের বিলাসিনীদের হাতে flirting fan থাকত। মানবজাতির

কাণ্ডজ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় ওসব অনাবশ্যক প্রথা লোপ পেয়েছে। বর্তমান কর্মময় যুগে পথচারী বাঙালী কোঁচার দায়ে এক হাত পঙ্গু করেছে এই দৃশ্য অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। কোঁচার নীচের অংশটা কোমরে গুঁজলে ক্ষতি কি?

শৌখিন ধনী বাঙালী যাঁরা সাধারণতঃ ইওরোপীয় পরিচ্ছদ ধারণ করেন তাঁরাও বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদির সভায় ধুতি পরে আসেন। অনেকের পরনে আভিজাত্যসূচক ৫২ ইঞ্চি বা আরও বেশী বহরের সূক্ষ্ম ধুতি থাকে, হাঁটবার সময় কোঁচার স্তবকতুল্য নিম্নভাগ মাটিতে লুটয়। চণ্ডীদাসের নায়িকা যেমন নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলত, শৌখিন বাঙালী নাগরিক তেমনি কোঁচাটি লুটিয়ে ঝোঁটিয়ে ঝোঁটিয়ে চলে। একজন সুপরিচিত ভদ্রলোককে বলেছিলাম— মাটিতে যত ময়লা আছে সবই যে কোঁচায় লাগছে! উত্তর দিলেন, লাগুক গে, কালই তো লনড্রিতে যাবে।

আজকাল অনেকের পরনে যে পাতলা কাপড়ের পায়জামা বা ইজার দেখা যায় তা নানা বিষয়ে ধুতির চাইতে শ্রেষ্ঠ। ওজন কম, দামও ধুতির কাছাকাছি, কোঁচার বালাই নেই। যাদের দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়— যেমন ডাক্তার বিজ্ঞানী যন্ত্রী ইত্যাদি — তাদের পক্ষে ধুতির চাইতে পাজামা বা ইজার সুবিধাজনক।

সম্প্রতি মোটা কাপড়ের প্যাণ্ট বা ট্রাউজারের খুব চলন হয়েছে। শুনতে পাই, স্মার্টনেসের লক্ষণ হচ্ছে ঘোর রঙের প্যাণ্টের উপর সাদা বা ফিকা রঙের শার্ট। শার্ট পুরো হাতা

হওয়া চাই, কিন্তু কনুই পর্যন্ত আস্তিন গোটানো থাকবে। গরিব গৃহস্থকেও ছেলের শখ মেটাবার জন্য দামী কাপড়ের প্যাণ্ট-শার্ট যোগাতে হয়।

অনেককে বলতে শুনেছি— ড্রিল কর্ডুরয় প্রভৃতি মোটা রঙিন কাপড়ের প্যাণ্ট মোটের উপর ধুতির চাইতে সস্তা। কারণ, ময়লা হলে সহজে ধরা যায় না, কাচতে হয় না, বার বার ধোবার বাড়ি দিতে হয় না, সহজে ছেঁড়ে না, বহু কাল পরা চলে। এই যুক্তিতে ফাঁকি আছে। ধুতি যদি সাদা না হয়ে বাদামী খাকী বা ছাই রঙের হত, এবং রোজ কাচা না হত তবে তাও দীর্ঘস্থায়ী হত। দোষ আমাদের প্রথার বা ফ্যাশনের, ধুতির নয়। ধুতি সাদা হওয়া চাই, রোজ কেচে শুদ্ধ করা চাই, কিন্তু মোটা রঙিন প্যাণ্ট কাচা হয় না, যত দিন তার মলিনতা চোখে দেখা না যায় তত দিন তার বাহ্যাভ্যন্তর শুচি।

পরিধেয় বস্ত্রে দু রকম ময়লা লাগে— দেহের ক্লেদ (ঘাম, তেল ইত্যাদি), এবং বাইরের বিশেষত বাতাসের ধুলো আর ধোঁয়া। শুকনো কাপড়ের চাইতে ভিজে কাপড়ে বাতাসের ময়লা বেশী লাগে কাচা কাপড় যখন ভিজে অবস্থায় শুখোতে দেওয়া হয় তখন বাতাসের ধুলো আর ধোঁয়া তাতে আটকে যায়। এই কারণে প্রতিবার কাচার পর কাপড়ের মলিনতা বাড়ে, গাত্রজ মল দূর হলেও বায়ুস্থিত মল ক্রমশ জমা হতে থাকে। শহরের বাইরে কাপড় শীঘ্র ময়লা হয় না, কারণ সেখানে ধুলো-ধোঁয়া কম। আমাদের চিরাগত প্রথা— ধুতি

শাড়ি প্রত্যহ কেচে শুদ্ধ করে নিতে হবে। বার বার কাচার ফলে কাপড় জীর্ণ হয়, ধূলো-ধোঁয়ায় ময়লা হয়— এই অসুবিধা আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু মোটা প্যাণ্টের বেলায় আমাদের ধারণা অন্য রকম। দেহের ময়লা প্যাণ্টেও লাগে, প্রতিবার প্রস্রাবের পর তাও দু-চার ফোঁটা লাগে, কিন্তু এ সব গ্রাহ্য করা হয় না।

অতএব দেহজ মল আর বায়ুজ মল দুয়ের মধ্যে একটাকে আমাদের মেনে নিতে হবে কিংবা রফা করতে হবে। মোটা প্যাণ্ট নিত্য কাচা অসম্ভব, কিন্তু পাতলা পাজামা বা ইজার যদি মাঝে মাঝে কাচা হয় তবে কতকটা ধুতির তুল্য শুদ্ধ হতে পারে। মোটা প্যাণ্ট পরা ফ্যাশন-সম্মত হলেও যুক্তিসংগত নয়, অন্তত গরমের সময় নয়। সব দিক দিয়ে বিচার করলে আমাদের নিত্য পরিধানের জন্য পাতলা কাপড়ের পাজামা বা ইজার বা আট-হাতী ধুতি প্রশস্ত।

ধুতি আর পাজামার যে গুণ, পঞ্জাবিরও তা আছে, গায়ে লেপটে থাকে না, হাওয়া লাগতে দেয়। ভিতরে গেঞ্জি বা ফতুয়া পরলে পঞ্জাবি নিত্য কাচতে হয় না, ভিতরের জামা কাচলেই চলে। পঞ্জাবির ঝুল নিতম্ব পর্যন্ত হওয়াই ভাল, বেশী হলে অনর্থক বায়ুরোধ আর তাপবৃদ্ধি করে। পাতলা কাপড়ের কোট (বা কোট তুল্য পঞ্জাবি) আরও ভাল, কারণ সহজেই পরা আর খোলা যায়, বেশী ঢিলা করবার দরকার হয় না।

ব্রিটিশ রাজত্বে আমাদের দরবারী পোশাক ছিল ইজার

চাপকান চোগা আর শামলা বা পাগড়ি, সাহেব আর ইঙ্গ-বঙ্গের পক্ষে ড্রেস স্যুট। বর্তমান ভারত সরকার কর্তৃক বিহিত দরবারী পোশাক সাদা চুড়িদার পাজামা আর আচকান। দুটোই আপত্তিজনক। চুড়িদার পাজামা পায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে, পরতে আর খুলতে মেহনত হয়। আজানুলম্বিত আচকান পরলে অনর্থক কাপড়ের বোঝা বইতে হয়। ঠাণ্ডায় অসুবিধা না হতে পারে, কিন্তু গরমের সময় বায়ুরোধ করে। শ্রীরাজ-গোপালচারীর মতন ধুতি পঞ্জাবি অথবা বিভিন্ন প্রদেশে যে ভব্য পরিচ্ছদ প্রচলিত আছে তাই দরবারী পোশাক গণ্য হবে না কেন?

কনভোকেশনের সময় গ্রাজুয়েটদের যে পোশাক পরতে বাধ্য করা হয়— কালো বা রঙিন কাপড়ের জোব্বা আর মাথায় থোপনা দেওয়া স্লেট— তা সার্বজাতিক হতে পারে, কিন্তু যেমন বিশ্রী তেমনি জবড়জঙ্গ। কয়েক বৎসর আগে শান্তিনিকেতনে উৎসবাদি উপলক্ষ্যে অধ্যাপকদের বিহিত পরিচ্ছদ ছিল ধুতি-পঞ্জাবির উপর বাসন্তী রঙের উত্তরীয়। এখনও সেই প্রথা আছে কিনা জানি না। সেই রকম সুলভ শোভন পরিচ্ছদ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তন করতে পারেন।

সাধারণত বাঙালী মাথা ঢাকে না। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে কলকাতার একটি বিলাতী কম্পানি বাঙালীর জন্য বিশেষ এক রকম টুপি চালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু একটাও বেচতে পারে নি। মহাত্মা গান্ধী যেসব বস্তু উদ্‌ভাবন করেছেন তার

মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বস্তু গান্ধীটুপি। সস্তা, হালকা, সহজে কাচা যায়, ঠাণ্ডা আর রোদ থেকে কতকটা মাথা বাঁচায়, টাক ঢাকে। গৈরিকধারীকে দেখলে যেমন মনে হয় লোকটি সাধু ধর্মাত্মা তেমনি গান্ধীটুপিধারীকে মনে হয় কংগ্রেসকর্মী বা দেশসেবক। যেসব রাজনীতিক সভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক একত্র হয় সেখানে বাঙালী গান্ধীটুপির প্রভাবে সহজেই দলে মিশে যেতে পারে, তাকে হংস মধ্যে বক মনে হয় না। কিন্তু যেখানে রোদ থেকে মাথা বাঁচানোই উদ্দেশ্য সেখানে হ্যাটই শ্রেষ্ঠ শিরস্ত্রাণ। বহুকাল পূর্বে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'প্রবাসী'তে লিখেছিলেন, রোদের সময় ধুতির সঙ্গে হ্যাট পরা যেতে পারে। পুলিসের শিরস্ত্রাণ যদি লাল পাগড়ির বদলে সোলা-হ্যাট করা হয় তবে ওজন কমবে, দামও বাড়বে না, মাথা গরম হবে না, অন্তত বাঙালী কনস্টেবলরা খুশী হবে। এ দেশের সোলা-হ্যাট-শিল্প লোপ পেতে বসেছে, কারণ বিলাতে এখন তার আদর নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি পুলিসের জন্য সোলা-হ্যাটের প্রবর্তন করেন তবে অনেকের উপকার হবে।

কালিদাস নারীর অশিক্ষিতপটুত্বের উল্লেখ করেছেন। তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বঙ্গনারীর পরিচ্ছদ। বাঙালী পুরুষ অনুকরণে পটু, এককালে মোগলাই সাজের নকল করেছিল, তার পর ইওরোপীয় পোশাকও নিয়েছে। কিন্তু বাঙালীর মেয়ে তার স্বাতন্ত্র্য হারায় নি। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর যুগে সে কাছা দিয়ে শাড়ি পরত, কবি হেমচন্দ্রের আমলে 'লাজে অবনতমুখী তনুখানি

আবরি' জুজুবুড়ী সেজে থাকত। কিন্তু আধুনিকী বাঙালিনী সুপর্ণা বিহঙ্গীর ন্যায় শোভনচ্ছদা হয়েছে, চিরন্তন পরিচ্ছদ বজায় রেখেও স্বাস্থ্যের অনুকূল সুরুচিসম্মত সুদৃশ্য সজ্জা উদ্ভাবন করেছে। দেশে বিদেশে শাড়ি অজস্র প্রশংসা পেয়েছে। যেসব ভারতললনা আঠারো হাতী শাড়ি কাছা দিয়ে পরে এবং যারা সালোআর-কমীজ-দোপাট্টায় অভ্যস্ত তারাও ক্রমশ বাঙালীর অনুসরণ করছে।

কিন্তু একটা কথা ভাববার আছে। শাড়ি-ব্লাউজ ঘরে বাইরে সুশোভন পরিচ্ছদ, কিন্তু আজকাল অনেক মেয়ে শিক্ষা বা জীবিকার জন্য যে ধরনের কাজ করে তার পক্ষে শাড়ি সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত নাও হতে পারে। যান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক আর চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে শাড়ির আঁচল একটা বাধা, বিপদের কারণও হতে পারে। সুবিধা আর নিরাপত্তার জন্য বোধ হয় ক্ষেত্র বিশেষে শাড়ির বদলে স্কার্ট বা স্ল্যাক্‌স জাতীয় পরিধেয়ই বেশী উপযুক্ত।

১৮৭৮

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* আজ যাঁকে আমরা স্মরণ করছি, সাধারণে তাঁকে জানে— তিনি চিত্রকলায় নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন, নূতন ধরনের রূপকথা আর রূপনাট্য লিখেছেন। কেউ কেউ আরও জানে— তিনি গাছের আঁকাবাঁকা ডাল কেটে কাটুম কুটুম নাম দিয়ে অদ্ভুত মূর্তি গড়তেন এবং চমৎকার গল্প বলতে পারতেন। অবনীন্দ্রনাথ প্রধানত নূতন চিত্রকলা আর নূতন সাহিত্যের স্রষ্টা, সুতরাং আজকের এই সভায় কোনও বিখ্যাত চিত্ররসজ্ঞ বা সাহিত্যিককে সভাপতি করাই উচিত ছিল। চিত্র সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নেই, সাহিত্যের জ্ঞানও নগণ্য। সভার আহ্বায়করা হয়তো স্থবির বলেই আমাকে ধরে এনেছেন। অতএব একজন সাধারণ অতিবৃদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্বল করেই কিছু বলছি।

আমার ছেলেবেলায় অর্থাৎ প্রায় ষাট বৎসর আগে যখন অবনীন্দ্রনাথ খ্যাত হন নি তখন শিক্ষিত লোকদের বলতে শুনেছি— এদেশের আর্ট অতি কাঁচা, ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তিতে বিস্তর গলদ। আমাদের উচিত ইটালি থেকে ভাল sculptor আনিয়ে শিব দুর্গা রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি দেবদেবীর মূর্তি

* রবীন্দ্রভারতী-ভবনে জন্মোৎসব সভায় পঠিত। ১৩ই ভাদ্র ১৩৬৩।

গড়ানো এবং তার আদর্শে এদেশের মূর্তিকার আর চিত্রকারদের শিক্ষিত করা। সে সময়ে বউবাজারের আর্ট স্টুডিওর ছবি ঘরে ঘরে দেখা যেত, কিছুকাল পরে রবি বর্মার ছবি আরও জনপ্রিয় হল। সাধারণে মনে করত, যে ছবি বা বিগ্রহ ফোটোগ্রাফের মতন যথাযথ বা ইওরোপীয় পদ্ধতির অনুযায়ী তাই উৎকৃষ্ট। সেই প্রচলিত ধারণা অগ্রাহ্য করে অবনীন্দ্রনাথ চিত্ররচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি এদেশের প্রাচীন কলাশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন, ভারত পারস্য চীন জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের চিরাগত পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন, এবং নিজের উদ্ভাবিত নূতন পদ্ধতিতে আঁকতে লাগলেন। অসাধারণ কিছু করতে গেলেই গঞ্জনা সইতে হয়। অবনীন্দ্রনাথও নিন্দিত হলেন, তার আগে রবীন্দ্র-নাথ যেমন হয়েছিলেন। ভাগ্যক্রমে কয়েকজন প্রভাবশালী গুণজ্ঞ ছিলেন, যেমন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের চেষ্টায় অবনীন্দ্র-চিত্রাবলী ক্রমশ বহুপ্রচারিত হল। আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হাভেল সাহেবের গ্রন্থ পড়েও শিক্ষিত সমাজ নবদৃষ্টি লাভ করলেন।

এখন আমাদের শিক্ষিত জন বুঝেছেন যে আর্টের সীমা সংকীর্ণ নয়, চিত্র আর বিগ্রহ বাস্তবের অনুযায়ী না হলেও সার্থক হতে পারে। মানুষ শুধু প্রকৃতিসৃষ্ট বাস্তব রূপে তৃপ্ত হয় না, নিজেও রূপ সৃষ্টি করতে চায়, গুণী, শিল্পী প্রাকৃতিক রীতি লঙ্ঘন করেও নব নব মনোজ্ঞ রূপ উদ্ভাবন করতে পারেন। দেবমূর্তির অনেক হাত অনেক মাথা, কান পর্যন্ত

টানা চোখ, ঝোলা কান, লতানে আঙুল প্রভৃতি অসভ্যতার লক্ষণ নাও হতে পারে। অশোকস্তম্ভের সিংহ, দক্ষিণ-ভারতের গজবিড়াল মূর্তি প্রভৃতি অস্বাভাবিক হলেও সার্থক সৃষ্টি, যেমন মিসর দেশের স্ফিংক্স আর বিলাতের ইউনিকর্ন কল্পিত প্রাণী হলেও চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উদার বুদ্ধি এখন আমাদের হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যভাগ্য অসাধারণ। নন্দলাল প্রমুখ প্রতিভাবান শিল্পিবৃন্দের চেষ্টার ফলে ভারতীয় নবচিত্রকলা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করেছে। যেমন পাশ্চাত্ত্য দেশের তেমনি এদেশের শিল্পীরাও নব নব পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করছেন। অবনীন্দ্রনাথ যে মার্গের সূচনা করেছিলেন তা ক্রমশ বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করছে।

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনা সম্বন্ধে কিছু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। যেমন তাঁর চিত্রপদ্ধতি তেমনি তাঁর রূপকথা আর রূপনাট্য বা যাত্রা-পালার রচনা-পদ্ধতি একবারে নূতন। সম্প্রতি বিখ্যাত লেখক Gerald Bullet-এর একটি প্রবন্ধ পড়েছি— Facts and Fairy-Tales। তাতে তিনি বাইবেল-পাঠক সম্বন্ধে লিখেছেন— He need not believe that the stories really happened: He is free to regard them as allegories, fables or fairy-tales, items in a sublime mythology, ··· just as very young children accept and enjoy fairy-tales

without either believing or disbelieving them to be fact। বাইবেল-পাঠক আর very young children সম্বন্ধে বুলেট যা বলেছেন, ছোট বড় নির্বিশেষে রূপকথার সকল পাঠক সম্বন্ধেই তা খাটে। ছেলেমানুষ না হলেও রূপকথা উপভোগ করা যায়। সত্যাসত্য বিচারের দরকার হয় না, আমাদের স্বভাবনিহিত কোনও গূঢ় কারণে সুরচিত রূপকথা তথা পুরাণকথা শুনে আমরা মুগ্ধ হই। এই মোহিনী শক্তির প্রধান সহায় বিশেষ প্রকার বর্ণনাভঙ্গী। আমাদের দেশের গল্প বলার গ্রাম্য পদ্ধতিতে সেই ভঙ্গী পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রূপকথার জন্য নূতনতর বর্ণনাভঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, তার ফলে তাঁর 'ক্ষীরের পুতুল', 'বুড়ো আঙলা', মাসী-পিসীর গল্প, স্টীমার ভ্রমণ কথা, যাত্রার পালা প্রভৃতি অসামান্য মনোহারিতা পেয়েছে। তাঁর মৌখিক আলাপেও এই মনোহারিতার পরিচয় পাওয়া যেত। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্তা রানী চন্দ সেই আলাপ লিপিবদ্ধ করে স্থায়ী করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রকলার জন্য যেমন অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন, তেমনি তাঁর সাহিত্যরচনায় নিজের চারিত্রিক স্পর্শ এমন করে রেখে গেছেন যে পড়লেই তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করা যায়।

১৮৭৮

গল্পের বাজার

অন্য জন্তুর সঙ্গে মানুষের অনেক তফাত আছে। আমরা খাড়া হয়ে হাঁটি, আঙুল দিয়ে কলম ধরি, দাড়ি কামাই, নেশা করি। নেশা মানে শুধু মদ গাঁজা আফিম নয়, পান তামাক চা-ও নয়, জীবনধারণের জন্যে যা অনাবশ্যক অথচ অভ্যাস করলে যাতে সহজেই প্রবল আসক্তি আসে, তারই নাম নেশা। ব্যসন শব্দেরও এই অর্থ। মৃগয়া দ্যূত দিবানিদ্রা পরনিন্দা নৃত্য গীত ক্রীড়া বৃথাভ্রমণ বেশ্যা মদ, এই দশটি শাস্ত্রোক্ত কামজ ব্যসন। সদর্থেও ব্যসন শব্দের প্রয়োগ আছে। মহাত্মাদের একটি লক্ষণ বলা হয়েছে— ব্যসনং শ্রুতৌ, অর্থাৎ বেদবিদ্যায় আসক্তি। শখ আসক্তি ব্যসন আর নেশা, নির্দোষ বা সদোষ যাই হক, মোটামুটি একই শ্রেণীতে পড়ে।

আগের তুলনায় এখন আমাদের নেশার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সেকালের তর্জা, কবিগান, মেড়ার লড়াই, বাচখেলা, বাইনাচ ইত্যাদির চাইতে এখনকার রেডিও, সিনেমা, থিয়েটার, জলসা, ফুটবল-ক্রিকেট ম্যাচ ইত্যাদির বৈচিত্র্য আর আকর্ষণ বেশী। এ সবের চাইতেও ব্যাপক নেশার জিনিস গল্পের বই। আজকাল সাহিত্য বললে অধিকাংশ লোকে কথাসাহিত্যই বোঝে। অনেক লোক আছে যারা কোনও রকম নেশা না করে অর্থাৎ পান তামাক সিগারেট চা পর্যন্ত না

খেয়ে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করে। তেমনি এমন লোকও আছে যাদের গল্প পড়বার আগ্রহ কিছুমাত্র নেই। তবু বলা যেতে পারে, শিক্ষিত আর অল্পশিক্ষিত আবালবৃদ্ধবনিতা অসংখ্য লোকে গল্পের বই পড়ে এবং অনেকের পক্ষে তা প্রবল আসক্তি বা নেশার বস্তু।

বঙ্কিমচন্দ্র লেখকদের উপদেশ দিয়েছেন— টাকার জন্য লিখিবে না। কিন্তু ছাপাখানার মালিককে তিনি বলেন নি— টাকার জন্য ছাপিবে না। তাঁর আমলে লেখক আর পাঠক দুইই কম ছিল, সুতরাং লেখককে নিঃস্বার্থ জনশিক্ষক মনে করা চলত। কিন্তু একালে চা আর সিগারেটের মতন গল্পের বই অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে, পাঠকরাও দাম দিতে প্রস্তুত, সুতরাং মুদ্রাকর দপ্তরী আর প্রকাশকের দাবি মেনে নিয়ে শুধু লেখককে বঞ্চিত করার কারণ নেই। জনসাধারণের গল্পপ্রীতি বেড়ে যাওয়ার ফলে বাঙালী একটি সম্মানিত নূতন জীবিকার সন্ধান পেয়েছে। গল্পকার শুধু লেখক নন, কবি আর চিত্রকরের তুল্য কলাবিৎ, ইন্দ্রজালিকের সঙ্গেও তাঁর সাদৃশ্য আছে। কাল্পনিক ঘটনার বিবৃতির দ্বারা তিনি পাঠককে সম্মোহিত ও রসাবিষ্ট করেন। গল্পগ্রন্থের আদর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের চাইতে ঢের বেশী, টেক্স্‌টবুকের নীচেই তার কাটতি।

ষাট-সত্তর বৎসর আগে যখন বাঙলা গল্পের খুব অভাব ছিল, তখন লোকে অবসরকালে কি পড়ত, তাদের রুচি কিরকম ছিল, এই সব খবর আধুনিক লেখক আর পাঠকদের অনেকেই জানেন

না। বাঙলা বা ইংরেজী গল্পগ্রন্থের জ্ঞান আমার অতি অল্প, সেকালের সাহিত্যসেবীদের সঙ্গেও আমার যোগ ছিল না। তথাপি তখনকার পাঠকদের অবস্থা সম্বন্ধে আমার যতটুকু জানা আছে তা বলছি।

তখন গল্পখোর বাঙালীর প্রধান সম্বল ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের এগারোটি উপন্যাস, রমেশচন্দ্রের ছটি, তারকনাথের স্বর্ণলতা, স্বর্ণকুমারী দেবীর কয়েকটি গল্প, রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি আর বউঠাকুরানীর হাট, এবং আরব্য উপন্যাস। আরও কতকগুলি ভাল মাঝারি মন্দ গল্পের বই প্রচলিত ছিল, কিন্তু তার অধিকাংশই এখন লোপ পেয়েছে, নাম পর্যন্ত লোকে ভুলে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তখন সবে ছোটগল্প লিখতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু অল্প পাঠকই তার খবর রাখত। শরৎচন্দ্র আর প্রভাতকুমার তখনও কলম ধরেন নি। সেই গল্পাল্পতার যুগে পাঠকের স্পৃহা কি করে মিটত? তখন কৃত্তিবাস কাশীরাম আর ভারতচন্দ্রের রচনা লোকে সাগ্রহে পড়ত, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র আর রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটক খুব জনপ্রিয় ছিল, মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র এবং অনেক নিকৃষ্ট কবির রচনাও লোকে পড়ত, কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য বহুপ্রচারিত হয় নি, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা একটু দুরূহ ছিল। এখনকার মতন তখনও অধিকাংশ পাঠক কবিতার চাইতে গল্পেরই বেশী ভক্ত ছিল, কিন্তু যথেষ্ট গল্পের বই না থাকায় কবিতার পাঠক এখনকার তুলনায় সেকালে বেশী ছিল।

তখন শুধু বাঙলা বই পড়ে পাঠকের বুভুক্ষা মিটত না, প্রচুর
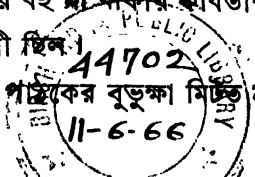
ইংরেজী গল্পও লোকে পড়ত। আশ্চর্য এই, সেকালে সদ্য এনট্রান্স পাস করা ছাত্র এবং অনেকে যারা পাস করে নি তারাও ইংরেজী নভেল পড়ত, অথচ শুনতে পাই এখনকার অধিকাংশ গ্রাজুয়েট ইংরেজী নভেল বুঝতে পারে না। নব্য বাঙালীর শক্তি বা রুচির এই পরিবর্তন উন্নতি কি অবনতির লক্ষণ তা শিক্ষা-বিশারদগণ বলতে পারেন।

আজকাল পাশ্চাত্ত্য দেশে কোনও শক্তিমান লেখকের আবির্ভাব হলে এদেশে অবিলম্বে তার খবর আসে। সেকালে এমন হত না। অল্প কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত লোক নূতন বইএর সন্ধান রাখতেন কিন্তু আর সকলের পাঠ্য ছিল প্রাচীন লেখকদের রচনা। তখন কলেজ স্ট্রীটের বইএর দোকানে ক্লাসিক ভিন্ন অন্য ইংরেজী নভেল পাওয়া যেত না, পাঠকরা হগ মার্কেট, রেলওয়ে বুকস্টল প্রভৃতি থেকে তাঁদের প্রিয় গল্পের বই যোগাড় করতেন। শিক্ষকরা মনে করতেন ছাত্রদের পক্ষে অবাধ নভেল পাঠ ভাল নয়, তাঁরা বলতেন, রবিনসন ক্রুসো, গলিভাস ট্রাভ্‌লস, রাসেলাস, ভিকার অভ ওয়েকফিল্ড পড়তে পার, স্কটের বইও দু-চারখানা পড়তে পার, কিন্তু তার বেশী নয়। তখন কোনান ডয়েল সবে লিখতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু তার খবর অল্প বাঙালীই জানত।

সেকালে নভেলখোর বাঙালীর প্রধান পাঠ্য ছিল স্কট, ডিকেন্স, লিটন, থ্যাকারে, ভিকটর হিউগো, রাইডার হ্যাগার্ড, মারি করেলি, ডুমা ইত্যাদি। হার্ডি, গল্‌সওয়ার্দি আর টলস্টয়ের

নাম সাধারণ পাঠকের অজ্ঞাত ছিল। রাশি রাশি অতি সস্তা মার্কিন ডিটেকটিভ আর ওআইল্ড ওয়েস্টের গল্প আমদানি হত, কিন্তু অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে তার স্ল্যাং-বহুল ভাষা একটু দুর্বোধ ছিল। লোকে সব চেয়ে বেশী পড়ত রেনল্ড্‌সের রোমাঞ্চকর গল্পাবলী, ডিক্‌স এডিশন, ছ আনায় একখানা বেশ বড় বই, বিস্তর ছবি। অতি ছোট হরপে ছাপা, কিন্তু যারা পড়ত তাদের চোখের তেজ ছিল, মিটমিটে প্রদীপ বা হারিকেনের আলোয় অনায়াসে পড়া চলত। আমার এক মাস্টার মশাই গোগ্রাসে রেনল্ড্‌স গিলতেন। আমাকে বলেছিলেন, খবরদার, ত্রিশ বছর বয়সের আগে রেনল্ড্‌স ছোঁবে না। কিন্তু আমার দাদা বললেন, শুনিস না মাস্টারের কথা, রেনল্ড্‌সের রবার্ট ম্যাকেয়ার পড়ে দেখিস, চমৎকার ডাকাতের গল্প; তার পর রাইহাউস প্লট, নেক্রোমান্সার, ব্রঞ্জ স্ট্যাচু এই সব পড়বি। আমি দাদার উপদেশই পালন করেছিলাম। অল্প বয়সেই একগাদা রেনল্ড্‌স পড়া হয়ে গেল, অরুচিও ধরল।

ডিক্‌স এডিশনের মতন সস্তা বই এখন স্বপ্নের অগোচর। শেক্‌স্পীয়র, মিলটন, শেলী, বাইরন প্রভৃতির সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর দাম ছিল বারো আনা। ডিকেন্স স্কট লিটন ইত্যাদির উপন্যাস ছ আনা মাত্র। অতি গরিব পাঠকও অল্প খরচে অনেক বই সংগ্রহ করতে পারত।

এককালে যাঁর বইএ এ দেশের বাজার ছেয়ে গিয়েছিল সেই রেনল্ড্‌সের কোনও চিহ্নই এখন পাওয়া যায় না। বিলাতেও

তাঁর বই প্রথম প্রথম খুব চলত। দু-একটি বইএ তিনি ব্রিটিশ রাজবংশের কুৎসা করেছিলেন সেজন্য কালক্রমে তাঁর জনপ্রিয়তা লোপ পায়। তাঁর গ্রন্থাবলীর কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আমার মনে আছে। দেদার রহস্য আর রোমাঞ্চ, কিছু ব্যভিচার, কিছু চুরি ডাকাতি নরহত্যা, এবং লর্ড লেডিদের বিলাসময় জীবন-যাত্রা। নায়ক-নায়িকারা রূপে গুণে অতুলনীয়, বিস্তর বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে বহু কষ্টভোগের পর তাদের মিলন হয়। অনেক বইএর শেষে থাকত— And they were happy, oh, supremely happy। অথবা— At last they were united in holy wedlock and lived happily ever after।

Yellow back নামে খ্যাত জনপ্রিয় ইংরেজী নভেলসমূহ এবং যেসব বাঙলা বইএর কাটতি সব চেয়ে বেশী তাদের রচনা-পদ্ধতি অনেকটা রেনল্ড্‌সের মতন। রূপকথা আর অধিকাংশ ডিটেকটিভ গল্পের পদ্ধতিও এই রকম। আমার মনে হয় সব রকম গল্পই মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীর গল্প রূপকথা জাতীয়, প্লটে যতই জটিলতা আর রোমহর্ষণ থাকুক, পরিশেষে পূর্ণ শান্তি, নায়ক-নায়িকার শারীরিক মানসিক আর্থিক সর্বাঙ্গীণ কুশল। পড়া শেষ হলে পাঠক হয়তো মনে মনে কিছুক্ষণ রোমন্থন করেন, কিন্তু তার পরে নিশ্চিন্ত হন, কারণ নায়ক-নায়িকার ভবিষ্যৎ একবারে নিষ্কণ্টক, দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পের নায়ক-নায়িকা অল্পাধিক আঘাত পায়, তার

ক্ষত সম্পূর্ণভাবে সারে না। লেখক মিলনান্ত করে গল্প সমাপ্ত করলেও কিছু কণ্টক রেখে দেন, তার ফলে পাঠকের মনে গল্পের জের চলতে থাকে। এই শ্রেণীর সকণ্টক গল্পকেই বোধ হয় মনস্তত্ত্বমূলক বলা হয়।

মহাভারতের অন্তর্গত সাবিত্রী-সত্যবান আর নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান প্রথম শ্রেণীর নিষ্কণ্টক গল্প। কিন্তু মহাভারতের মূল আখ্যান সকণ্টক দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। যুদ্ধজয়ের পর যুধিষ্ঠির ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। গ্রন্থ সমাপ্তির পরেও আমাদের ভাবনা হয়— যুধিষ্ঠিরের মন হয়তো শেষ পর্যন্ত অশান্ত ছিল, তবে ভীম বোধ হয় বেশ ফুর্তিতেই ছিলেন। দ্রৌপদী তাঁর পিতা ভ্রাতা আর পঞ্চ পুত্রের শোক নিশ্চয় ভুলতে পারেন নি, গান্ধারী আর তাঁর বিধবা পুত্রবধূদের সঙ্গে রাজপুরীতে বাসও বোধ হয় তাঁর পক্ষে সুখকর ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারানী আর যুগলাঙ্গুরীয় নিষ্কণ্টক গল্প, কিন্তু বিষবৃক্ষ সকণ্টক। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পুনর্মিলন হলেও তাঁদের সম্পর্ক আগের মতন হবার নয়। রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবিকে নিষ্কণ্টক গল্প বলা যেতে পারে, কারণ পাত্র-পাত্রীদের সমস্ত দুঃখ শেষকালে মিটে গেছে। কিন্তু তবু সন্দেহ থেকে যায়, জীবনের অত বড় বিপর্যয়ের পর কমলা তার অজ্ঞাত স্বামীকে আবিষ্কার করে কি পূর্ণ তৃপ্তি পেয়েছিল? শেষের কবিতা নিশ্চয় সকণ্টক গল্প। কেটিকে বিবাহ করে অমিত রায় কর্তব্যপালন করেছে, সেই সঙ্গে আত্মবিসর্জনও দিয়েছে। লাবণ্যর কাছে সে যেরকম উচ্ছ্বাসময় বক্তৃতা দিত,

কেটির কাছে তার কোনও কদর হবে মনে হয় না। অগত্যা সে হয়তো পলিটিক্স নিয়ে মেতে উঠে একজন দেশনেতা হয়ে যাবে। শরৎচন্দ্রের দত্তা নিষ্কণ্টক গল্প, কিন্তু বামুনের মেয়েতে কণ্টক আছে। প্রিয়নাথ ডাক্তার হয়তো সামলে উঠে আবার রোগী দেখা শুরু করবেন, কিন্তু তাঁর গর্বিতা কন্যার মনস্তাপ সহজে দূর হবে না।

এ দেশের এবং বোধ হয় সকল দেশেরই বেশীর ভাগ পাঠক প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ নিষ্কণ্টক গল্প চায় যার শেষে নায়ক-নায়িকা সুখে ঘরকন্না করে and live happily ever after। মামুলী ডিটেকটিভ কাহিনী এবং রোমাঞ্চ সিরিজের রূপসী বোম্বেটে জাতীয় গল্পও এই শ্রেণীতে পড়ে। ছোট ছেলেমেয়ের জন্য যেমন রূপকথা তেমনি অসংখ্য সাধারণ পাঠকের জন্য এমন গল্প দরকার যাতে প্রচুর আতঙ্ক আর উত্তেজনা আছে, প্রেমের লড়াইও আছে, কিন্তু যার পরিণাম নিষ্কণ্টক। যে পাঠকরা অপেক্ষাকৃত বিদগ্ধ এবং মানব-চিত্তের রহস্য সম্বন্ধে কুতূহলী, অর্থাৎ যাঁরা সমস্যাময় বাস্তব জীবনের চিত্র চান, তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর সকণ্টক গল্পই বেশী উপভোগ করেন।

১৮৭৯

সাহিত্যের পরিধি

রাম আর শ্যাম ঘোড়া নিয়ে তর্ক করছে। রাম সজোরে বলছে, ঘোড়ার মাপ অন্তত তিন হাত। ততোধিক জোরে শ্যাম বলছে, ঘোড়া দেড় ইঞ্চির বেশী হতেই পারে না। এরা কেউ দু রকম অর্থ স্বীকার করে না। ঘোড়া বললে রাম বোঝে যে ঘোড়া ঘাস খায়, আর শ্যাম বোঝে যা টিপলে বন্দুকের আওয়াজ হয়।

এই তর্কের হেতু— পৃথক বস্তু বোঝাবার জন্য একই শব্দের প্রয়োগ। এ রকম তর্ক বড় একটা শোনা যায় না, কিন্তু অর্থের ব্যাপ্তি সমান নয়। যেমন, যদু বলছে, ছানা আর চিনি একত্র পাক করলে যা হয় তারই নাম সন্দেশ। মধু বলছে, নাগ-মশাই দে-মশাই সেন-মশাই আর গঙ্গু-মশাই যা তৈরি করেন তাই হল সন্দেশ, আর সব সন্দেশই নয়। যারা আসল আর ভুয়ো গণতন্ত্র, সচ্চা আর ঝুটা আজাদি, খাঁটী আর ভেজাল হিন্দুধর্ম, ইত্যাদি নিয়ে বিতণ্ডা করে তারাও এই দলে পড়ে।

সাহিত্য সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে তর্ক শোনা যায় তা অনেকটা যদু-মধুর তর্কের তুল্য। তর্ককারীরা নিজের নিজের পছন্দসই গণ্ডির মধ্যে সাহিত্য শব্দের অর্থ আবদ্ধ রাখতে চান। কেউ বলেন, সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। কেউ বলেন শুধু রসে চলবে না, উচ্চ আদর্শ চাই। সংস্কৃতে কাব্য আর সাহিত্য

প্রায় সমার্থক। কিন্তু আধুনিক প্রয়োগে সাহিত্যের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। Concise Oxford Dictionaryতে literatureএর বিবৃতি আছে— writings whose value lies in beauty of form or emotional effect; *the* books treating of a subject; (colloq.) printed matter। বাঙলায় সাহিত্য শব্দ আজকাল যেসব অর্থে চলে তা এই ইংরেজী বিবৃতির অনুরূপ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরঙ্গ জনকে অনেক চিঠি লিখেছেন। মথুর কুণ্ডুও পাটের দর জানাবার জন্য শিবু শাকে চিঠি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তাই প্রকৃত চিঠি, আর মথুর কুণ্ডু যা লিখেছেন তা কিছুই নয়— এ কথা বলা চলে না। তুচ্ছ মহৎ ভাল মন্দ যাই হক, কবি প্রেমিক উকিল বা পাওনাদার যিনিই লিখুন, সমস্ত চিঠির সামান্য লক্ষণ— একজন অপর জনকে কিছু জানাবার জন্য যা লেখে। সাহিত্যেরও সামান্য লক্ষণ বলা যেতে পারে— একজন (বা এক দল) বহু জনকে কিছু জানাবার জন্য যা লেখে। সাহিত্য অতি তুচ্ছ হতে পারে, পাগলের প্রলাপ, বিপক্ষকে গালাগালি, বিজ্ঞাপন, টেক্স্‌টবুক, সংবাদপত্র, কবিতা, গল্প, জ্ঞানগর্ভ রচনা বা তত্ত্বকথা হতে পারে, তার পাঠকসংখ্যা নগণ্য বা অগণ্য হতে পারে। আপনার আমার যা ভাল লাগে কিংবা নামজাদা সমালোচক যাকে রসোত্তীর্ণ বলেন তাই সাহিত্য এবং আর সবই অসাহিত্য, এমন মনে করলে অর্থবিভ্রাট হবে।

সাহিত্যের আধুনিক অর্থ অতি ব্যাপক। কাব্যসাহিত্য, কথাসাহিত্য, শিশুসাহিত্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, রবীন্দ্রসাহিত্য তো আছেই, তা ছাড়া দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস জীবনী সমালোচনা বিজ্ঞাপন স্কুলপাঠ্য-সাহিত্য প্রভৃতি, এমন কি অশ্লীল সাহিত্যও শোনা যায়। এই সব প্রয়োগে সাহিত্যের অর্থ, *the* books treating of a subject, কোনও বিষয় সংক্রান্ত পুস্তকসমূহ।

আজকাল গাড়ি বললে বড়লোকরা বোঝেন মোটরকার। সেইরকম অনেক শিক্ষিত জন সাহিত্য শব্দে বোঝেন ললিত সাহিত্য, অর্থাৎ সর্বাগ্রে গল্প-উপন্যাস, তার পর কবিতা নাটক লঘুপ্রবন্ধ ও ভ্রমণকথা। Writings whose value lies in beauty of form or emotional effect, যার রচনাপদ্ধতি বা ভাষা মনোহর অথবা যা ভাবের উদ্রেক করে —এই অর্থই এখন অনেকে সাহিত্যের একমাত্র অর্থ মনে করেন। সাহিত্যদর্পণকারও বলেছেন, রসাত্মক বাক্যই কাব্য (=সাহিত্য)।

আত্মব্যঞ্জনা বা self-expressionএর জন্য মানুষ নানা প্রকার চেষ্টা করে, তারই একটির ফল সাহিত্য। সাহিত্যের মধ্যে উচ্চ নীচ ভাল মন্দ সবই আছে। কিন্তু সকল পাঠকের রুচি সমান নয়, একই পাঠকেরও রুচির বৈচিত্র্য থাকতে পারে। রাম সন্দেশ ভালবাসে, কিন্তু জিলিপি ছোঁয় না। শ্যামও সন্দেশের ভক্ত, কিন্তু সময়ে সময়ে জিলিপিই বেশী পছন্দ করে।

অধিকাংশ লোকের মতে সন্দেশই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কি রকম সন্দেশ? ভারত সরকার তেল ঘি ইত্যাদি অনেক জিনিসের standard বেঁধে দিয়েছেন, হয়তো ভবিষ্যতে এক-দুই-তিন নম্বর সন্দেশেরও উপাদানের অনুপাত নির্দেশ করে দেবেন। কিন্তু এক-দুই-তিন নম্বর সাহিত্যের মান বেঁধে দেবার শক্তি সাহিত্য-আকাডেমিরও নেই। বহু লোকের মতে বা পুলিসের দৃষ্টিতে যা অনিষ্টকর তা বর্জিত বা দমিত হবে, কিন্তু বিভিন্ন পাঠকের রুচি বা প্রয়োজন অনুসারেই অন্যান্য সাহিত্য প্রচলিত থাকবে।

অধিকাংশ জনপ্রিয় রচনার উপজীব্য মানুষের আচরণ ও চিত্তবৃত্তি, এবং সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ। কিন্তু এমন রচনাও উৎকৃষ্ট ও সমাদৃত হতে পারে যার পাত্র-পাত্রী আর ঘটনাবলী অপ্রাকৃত, যেমন Penguin Island, Animal Farm, রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ ইত্যাদি। ডিটেকটিভ এবং রহস্যমূলক রোমাঞ্চকর গল্পে emotional effect প্রচুর থাকে, তার পাঠকসংখ্যাও সকল দেশে সব চাইতে বেশী, তথাপি এই শ্রেণী রচনা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গণ্য হয় না। দৈবাৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন Conan Doyleএর Sherlock Holmesএর গল্প ক্লাসিক সাহিত্যের সম্মান পেয়েছে। Lewis Carrollএর Alice in Wonderland ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত হলেও সকল পাঠকের সমাদর পেয়ে চিরায়িত হয়েছে। সুকুমার রায়ের 'আবোলতাবোল' আরও উচ্চ শ্রেণীর রচনা মনে করি। চিত্র আর তক্ষণ কলায় যেমন impressionistic style এবং

অবাস্তব সংস্থান দ্বারা রসসৃষ্টি করা হয়, সুকুমার রায় তাঁর ছড়া রচনায় সেইরূপ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের পাঠক আর সমালোচকদের মধ্যে রামগরুড়ের ছানার বাহুল্য আছে তাই সুকুমার রায়ের প্রতিভা যথোচিত মর্যাদা পায় নি।

ইংরেজী অভিধানে যে beauty of form or emotional effectএর উল্লেখ আছে, কবি নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের একটি শ্লোকে তারই সমর্থন পাওয়া যায়—

যানেব শব্দান্ বয়মালপামঃ
যানেব চার্থান্ বয়মুল্লিখামঃ।
তৈরেব বিন্যাসবিশেষভব্যৈঃ
সম্মোহয়ন্তীহ কবয়ো জগন্তি॥

— আমরা যেসব শব্দ বলি, যেসব অর্থ প্রয়োগ করি, তাদেরই বিশেষপ্রকার ভব্য বিন্যাস দ্বারা কবিগণ জগৎকে সম্মোহিত করেন।

কিন্তু form বা শব্দবিন্যাসের উপর যদি অতিরিক্ত নির্ভর করা হয়, তবে emotion বা রসের চাইতে ভঙ্গীই বেশী প্রকট হয়। এরূপ রচনার বহু পাঠক হয় না। জেম্‌স জয়েসের অদ্ভুত রচনায় যাঁরা রস পান তাঁদের সংখ্যা অল্প। আমাদের দেশের কয়েকজন আধুনিক কবির রচনা সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ, কিন্তু একশ্রেণীর সমানধর্মা পাঠকের সমাদর পেয়েছে। বাঙলা কবিতায় যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা এখন দ্বিধা বিভক্ত।

একদল প্রাচীনপন্থী কবিদের কৃপার চক্ষে দেখেন, আর একদল অত্যাধুনিক কবিদের অপ্রকৃতিস্থ মনে করেন। কোনও নূতন পদ্ধতির প্রবর্তনকালে প্রায় মতভেদ দেখা যায়। কালক্রমে সেই পদ্ধতি বর্জিত বা বহুসমাদৃত হতে পারে অথবা চিরদিনই বিতর্কের বিষয় হয়ে টিকে থাকতে পারে। শত বৎসর পূর্বে বাঙলা কবিতায় যমক অনুপ্রাস ইত্যাদি শব্দালংকারের বাহুল্য ছিল, এখন আর নেই। এককালে গদ্য কবিতা অনেকের দৃষ্টিতে উপহাসের বিষয় ছিল, এখন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আদিরসাত্মক রচনা নিয়ে বোধ হয় চিরদিনই বিতর্ক চলবে।

ব্যাপক প্রয়োগে সাহিত্যের আধুনিক অর্থ— কোনও বিষয়-সংক্রান্ত পুস্তকসমূহ এবং যা কিছু ছাপা হয় (printed matter)। বিশিষ্ট প্রয়োগে— এমন গ্রন্থ যার রচনাপদ্ধতি বা ভাষা মনোহর, অথবা ভাবের উদ্রেক করে, অর্থাৎ যাতে রস আছে।

আর্ট-এর যেমন বাঙলা প্রতিশব্দ নেই, তেমনি রস-এর ইংরেজী নেই। মোটামুটি বলা যেতে পারে, রচনায় যে গুণ থাকলে পড়তে ভাল লাগে তারই নাম রস। অলংকার-শাস্ত্রে নবরসের উল্লেখ আছে— আদি (বা শৃঙ্গার), হাস্য, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত। কৌতূহলও একটা রস, বোধ হয় অদ্ভুতের অন্তর্গত। ডিটেকটিভ গল্পে এই রসই প্রধান। আমাদের আলংকারিকরা রস সম্বন্ধে বিস্তর লিখেছেন,

করুণ রস পড়ে লোকে কেন সুখ পায় তাও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

একশ্রেণীর সমালোচকরা বলেন, শুধু রসে চলবে না, উচ্চ আদর্শ থাকা চাই। সমাজের যা আদর্শ সাহিত্যেরও কি তাই? হিতোপদেশ, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, Pilgrim's Progress, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্‌ভাবশতক, ইত্যাদি গ্রন্থে উচ্চ আদর্শ আছে। রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে মুকুন্দ দাস যেসব যাত্রার পালা রচনা করেছিলেন তা নীতিবাক্যে পরিপূর্ণ। ক্ষেত্রবিশেষে এই সব রচনার অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কিন্তু সাহিত্যে যদি নীতিকথা বা সামাজিক আদর্শ প্রচারের বাহুল্য থাকে তবে তার রস শুখিয়ে যায়। হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ঘরে বাইরে, দেনা পাওনা, পথের পাঁচালি, ইত্যাদিতে উচ্চ আদর্শ কতটুকু আছে? আমরা নিজের জীবনে রোগ শোক নিষ্ঠুরতা কৃতঘ্নতা প্রতারণা ব্যভিচার ইত্যাদি চাই না, ভয়ানক আর বীভৎস রসও পরিহার করি, কিন্তু সাহিত্যে এ সমস্তই রসসৃষ্টির সহায়। পুণ্যের জয় আর পাপের পরাজয়ও সাহিত্যে অত্যাবশ্যক নয়।

ব্যক্তিগত বা সামাজিক আকাঙ্ক্ষা আর সাহিত্যিক আকাঙ্ক্ষা সমান নয়। মনোবিজ্ঞানীরা এই পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করেছেন, কিন্তু কোনও বহুসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। সাহিত্যের যে রস সুধীজনের কাম্য তা বহু জটিল উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের রসতত্ত্বের জ্ঞান নিতান্ত অস্পষ্ট, art for art's sake, মানব-কল্যাণের নিমিত্তই সাহিত্য, মানুষে

মানুষে মিলনের জন্যই সাহিত্য, জীবনের আলেখ্যই সাহিত্য— এই ধরনের উক্তিতে রসতত্ত্বের নিদান পাওয়া যায় না। উত্তম সাহিত্য আমাদের আনন্দ দেয়, কিন্তু কোন্ কোন্ রস কি ভাবে যোজিত হলে উত্তম সাহিত্য উৎপন্ন হয় তা আমরা জানি না। অনেক বৎসর পূর্বে এ সম্বন্ধে যা লিখেছিলাম তা থেকে কিছু পুনরুক্তি করছি।—

সাহিত্যের অনেক উপাদান নীতিবিরোধী, অনেক উপাদান পরস্পরবিরোধী, কিন্তু কৃতী রচয়িতা কোনও উপাদান বাদ দেন না। নিপুণ পাচক কটু তিক্ত মিষ্ট সুগন্ধ দুর্গন্ধ নানা উপাদান মিশিয়ে সুখাদ্য প্রস্তুত করে। নিপুণ সাহিত্যিকের পদ্ধতিও অনুরূপ। খাদ্যে কতটা ঘি দিলে উপাদেয় হবে, কটা লংকা দিলে মুখ জ্বালা করবে না, কতটা পেঁয়াজ রসুন দিলে উৎকট গন্ধ হবে না,— এবং সাহিত্যে শান্তরস আদিরস বা বীভৎসরস, সুনীতি বা দুর্নীতি, একনিষ্ঠ প্রেম বা ব্যভিচার, কত মাত্রায় থাকলে সুধীজনের উপভোগ্য হবে তার নিরূপণের সূত্র অজ্ঞাত। জন কতক ভোক্তার হয়তো কোনও বিশেষ রসে আসক্তি বা বিরক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাদের বিচারই চূড়ান্ত গণ্য হয় না। যিনি শুধু একশ্রেণীর ভোক্তার তৃপ্তিবিধান করেন অথবা জন-সাধারণের অভ্যস্ত ভোজ্যই পরিবেশন করেন তিনি সামান্য পেশাদার বা hack writer মাত্র। যাঁর রুচি অভিনব এবং যিনি বহু ভোক্তার রুচিকে নিজের রুচির অনুগত করতে পারেন তিনিই উত্তম সাহিত্যস্রষ্টা। যিনি কোনও লেখকের রচনায়

এই গুণ উপলব্ধি করে পাঠকগণকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন তিনিই উত্তম সমালোচক।

সকল দেশেই অল্প কয়েকজন বিচক্ষণ বোদ্ধা সাহিত্যের বিচারকরূপে গণ্য হয়ে থাকেন। এঁদের কেউ নির্বাচন করে না, নিজের প্রতিভাবলেই এঁরা বিচারকের পদ অধিকার করেন এবং পাঠকের রুচির উপর প্রভাব বিস্তার করেন। এঁরা কেবল রচনার রস বা উপভোগ্যতা দেখেন না, সমাজের উপর তার সম্ভাব্য প্রভাবও বিচার করেন। পাঠকের আনন্দ আর সামাজিক স্বাস্থ্য দুইএর প্রতিই তিনি দৃষ্টি রাখেন। তাঁর যাচাইএর পদ্ধতি কি রকম তা তিনি প্রকাশ করতে পারেন না, তাঁর নিজেরও বোধ হয় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নেই। সামাজিক আদর্শ চিরকাল একরকম থাকে না, সে কারণে রচনায় অল্পস্বল্প বিচ্যুতি থাকলে তিনি উপেক্ষা করেন, কিন্তু অধিক বিচ্যুতি মার্জনা করেন না। তাঁর সিদ্ধান্তে মাঝে মাঝে ভুল হতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত জন সাধারণত তাঁর অভিমতই প্রামাণিক মনে করেন।

১৮৭৯

বানানের সমতা ও সরলতা

কয়েক বৎসর পূর্বে একজন উত্তরপ্রদেশীয় লেখক আমার কাছে এসেছিলেন। একজন বাঙালী অধ্যাপকও তখন উপস্থিত ছিলেন। দুজনের পরিচয়ের পর অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন, পণ্ডিতজী, আমাদের জাতীয় সংগীত জন-গণ-মন হিন্দীতে অমন উৎকট বানানে লেখা হয় কেন—'দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গা, উচ্ছল-জলধিতরঙ্গা ?' শেষে অনর্থক আ-কার যোগ করেন কেন ? পণ্ডিতজী উত্তর দিলেন, বাবুজী, হিন্দী আর বাঙলা জবান এক নয়। আপনাদের অ-কার যেন awe, কিন্তু হিন্দীতে তেমন নয়, up-এর আদ্যক্ষর তুল্য হ্রস্ব। জন-গণ-মন গাইবার সময় সেই হ্রস্ব অ-কার আমরা টেনে দীর্ঘ করি, তার ফলে অ-কারান্ত বঙ্গ আমাদের উচ্চারণে বঙ্গা হয়ে যায়। শেষে আ-কার না দিলে লোকে পড়বে—দ্রাবিড়্, উৎকল্, বঙ্গ্, জলধিতরঙ্গ্। তুলসীদাসজীও তাঁর রামায়ণে ছন্দের প্রয়োজনে অনেক জায়গায় অ স্থানে আ করেছেন, যেমন, 'সুনি প্রভু বচন হরস হনুমানা, শরণাগত বচ্ছল ভগবানা।' আপনাদের বানানেও গলদ আছে। অ-কার হচ্ছে হ্রস্ব স্বর, তার আসল উচ্চারণ ভুলে গিয়ে তাকে awful করেছেন কেন ? হ্রস্ব অ-কার বোঝাবার জন্য আপনারা দীর্ঘ আ-কার দেন কোন্ হিসাবে ? bus, club, পঞ্জাব স্থানে বাস ক্লাব পাঞ্জাব লেখেন কেন ?

বাঙলা বানান নিয়ে বহু বিতর্ক হয়ে গেছে, এখন আর সেসব পুরনো কথার আলোচনা করব না। কতকগুলি শব্দের বানানে যে বৈষম্য বা জটিলতা দেখা যায় তার সম্বন্ধে কিছু বলছি।

বাঙলা আসামী ওড়িয়া হিন্দী মরাঠী গুজরাটী প্রভৃতি আর্যভাষার মধ্যে অনেক মিল আছে। এই মিল যত বজায় রাখা যায় ততই মঙ্গল। বাঙলা বইএর গুণগ্রাহী অবাঙালী পাঠক বিস্তর আছেন। আমরা যদি বাঙলা বানানে অনর্থক বৈষম্য আনি তবে অবাঙালী পাঠকের পক্ষে তা দুর্বোধ হবে, তার ফল বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে লাভজনক হবে না।

সংস্কৃতে অ কণ্ঠ্য বর্ণ, তার মূল উচ্চারণ up-এর আদ্যক্ষর তুল্য। এই হ্রস্ব অ টেনে উচ্চারণ করলেই আ হয়। ই ঈ যেমন মূলত একই ধ্বনি, শুধু প্রথমটি হ্রস্ব আর দ্বিতীয়টি দীর্ঘ, তেমনি অ আ মূলত একই, শুধু প্রথমটি হ্রস্ব, দ্বিতীয়টি দীর্ঘ। ইংরেজী fur যদি টেনে দীর্ঘ করা হয় তবে far হয়ে যায়। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে কলেক্টর পায়োনিয়র সর (sir) ক্লব ইত্যাদি বানান প্রচলিত ছিল। তখন অ-কারের মৌলিক অর্থাৎ up-এর আদ্যক্ষর তুল্য উচ্চারণ আমাদের অভ্যস্ত ছিল, তার ফলে বাঙলা হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় বহু শব্দে একই বানান চলত। বাঙালী তখন স্থানভেদে অ-কারের চার রকম উচ্চারণ করত, যেমন কটা, কটু, একটু, টি-কপ। 'কটা' শব্দে অ-কারের উচ্চারণ সংবৃত, অর্থাৎ ইংরেজী awe শব্দের তুল্য। এই

উচ্চারণ হিন্দীতে নেই। 'কট্' শব্দের অ-কার ও-কারের তুল্য। এও হিন্দীতে নেই। 'একটু' শব্দে অ-কার গ্রস্ত, অর্থাৎ ক-অক্ষর হসন্ত তুল্য। 'টি-কপ' শব্দে ক-এর উচ্চারণ বিবৃত, অর্থাৎ ইংরেজী cup-এর তুল্য, কিন্তু আধুনিক বাঙালী অ-কারের শেষোক্ত হ্রস্ব উচ্চারণ ভুলে গেছে, তার ফলে অ-কার স্থানে আ-কার চলছে, যেমন, ক্লাব, বাস, সার্কাস, কাটলেট। মাঝে মাঝে নাম্বারও দেখতে পাই, কিন্তু জজ এখনও জাজ হন নি।

হিন্দী মরাঠী গুজরাটীতে অ-কারের শুধু বিবৃত বা হ্রস্ব, এবং গ্রস্ত বা হসন্তবৎ উচ্চারণ আছে। 'কল বন বট'-এর হিন্দী উচ্চারণ cull, bun, but-এর তুল্য। গ্রস্ত অ-কার হিন্দীতে খুব বেশী, আমাদের 'জনতা বিমলা কামনা' হিন্দী উচ্চারণে 'জন্তা, বিম্লা, কাম্না।' কিন্তু হিন্দীতে সংবৃত অর্থাৎ awe-তুল্য অ-কার নেই, তা বোঝাবার জন্য আ-কার লেখা হয়, যেমন royal—রায়ল, talky—টাকি। সেকালে বাঙালীও এই রকম বানান করত, তার কয়েকটি নিদর্শন এখনও রয়ে গেছে, যেমন কালেজ, আগস্ট, লাট (lord বা lot)। ষাট-সত্তর বৎসর আগে law স্থানে 'লা' লেখা হত।

এককালে আমাদের অ-কারের যে শক্তি ছিল তা ফিরিয়ে আনা উচিত মনে করি। হ্রস্ব অ-কার স্থানে আ-কারের প্রয়োগ খুব বেশীদিনের নয়। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত দুর্গেশনন্দিনীর আখ্যাপত্রে আছে— 'অপর সরকিউলর রোড।' রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের পুরনো মুদ্রণে 'কটলেট, থর্ড' ইত্যাদি বানান দেখা যায়।

আমাদের লেখকরা একটু চেষ্টা করলেই অ-কারের অপপ্রয়োগ বন্ধ করে অ-কারের মৌলিক বিবৃত হ্রস্ব উচ্চারণ ফিরিয়ে আনতে পারেন। Bus স্থানে বাস না লিখে বস লিখলে কোনও ক্ষতি হবে না, সাধারণ লোকে এখন যতটা বিকৃত উচ্চারণ করে তার চাইতে বেশী বিকৃত করবে না। স্থানভেদে অ-কারের চার রকম উচ্চারণই বাঙলায় চলতে পারে, তাতে অবাঙালী পাঠকের উচ্চারণে ভুল হলেও অর্থবোধে বাধা হবে হবে না। জন-গণ-মন গানে সংবৃত অ-কার বোঝাবার জন্য যদি -বঙ্গা -তরঙ্গা লেখা হয় তাতে আমাদের আপত্তির কারণ নেই। আমরাও তো হিন্দী হৈ স্থানে হ্যায় লিখি।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-নিযুক্ত বানান-সমিতির নিয়মে অসংস্কৃত শব্দে ণ বাদ দিয়ে শুধু ন লেখার বিধান আছে। হিন্দী প্রভৃতিতেও অসংস্কৃত শব্দে ণ নেই, রানী, বরন (বর্ণ), মন (চল্লিশ সের) লেখা হয়। বাঙলায় 'গিণি সোণা' মূর্ধন্য ণ দিয়ে কেন লেখা হয় জানি না, হয়তো সোনার গৌরব-বৃদ্ধির জন্য।

বানান-সমিতির আর একটি নিয়ম— কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স এবং sh স্থানে শ হবে, যেমন, ইশারা তামাশা শয়তান শেমিজ-এ তালব্য শ, কিন্তু আসমান জিনিস সাদা নোটিস পুলিস-এ দন্ত্য স। হিন্দী প্রভৃতিতে এই রীতি মানা হয়, বাঙালী মুসলমান লেখকরাও তা মানেন। সকলেই এই নিয়মে বানান করলে সামঞ্জস্য আসবে।

আর একটি বিষয় বিচারের যোগ্য। অনেক শব্দে অনর্থক apostrophe বা ঊর্ধ্বকমা দেখতে পাই। বার্নার্ড শ', পাঁচ শ' ইত্যাদিতে ঊর্ধ্বকমার সার্থকতা কি? না দিলেও লোকে শ-এর ঠিক উচ্চারণ করবে, কেউ শ্ বলবে না। দু'দিন, ন'টাকা ইত্যাদি বানানে ঊর্ধ্বকমার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখি না। দুই থেকে দু, নয় থেকে ন হয়েছে তা জানবার কি দরকার? দু ছ ন শ ইত্যাদি স্বপ্রতিষ্ঠ শব্দ, এদের ব্যুৎপত্তি না জানালে কোনও ক্ষতি হয় না। সাধু রূপ 'তাহা তাহাকে তাহাতে তাহার' থেকে চলিত রূপ 'তা তাকে তাতে তার' হয়েছে, কিন্তু ঊর্ধ্বকমা দেওয়া হয় না।

লখনউ-এর যারা বাসিন্দা তারা সরল বানান লেখে ল খ ন উ, কিন্তু বাঙালী অনর্থক লক্ষ্ণৌ লেখে কেন? 'দরভঙ্গা'য় দ্বার নেই, বঙ্গের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই, তবু দ্বারবঙ্গ লেখা হয় কেন? আর একটা উৎকট বানান sir স্থানে স্যার। যেমন ক্যাট হ্যাট ব্যাট, তেমনি স্যার। শুধু সার লিখলেই চলে, সেকেলে বানান সর আরও ভাল মনে করি।

অনেকে মনে করেন বিদেশী শব্দের হসন্ত উচ্চারণ বোঝাবার জন্য শেষে হস্‌চিহ্ন দিতেই হবে। এঁরা লেখেন— কাট্‌লেট্‌, টি-পট্‌, প্লেট্‌, ডিশ্‌। হস্‌চিহ্ন না দিয়ে যদি শুধু ডিশ লেখা হয় তবে লোকে ডিশঅ পড়বে এমন ভয় আছে কি? অনর্থক হস্‌চিহ্ন দিয়ে লেখা কণ্টকিত করায় লাভ নেই।

অনেকে 'মেইন, চেইন, টেইলার' লেখেন। এঁদের যুক্তি—

ইংরেজি শব্দে i অক্ষর আছে, উচ্চারণেও তার প্রভাব পড়ে। এই যুক্তি মিথ্যা। এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় যথাযথ প্রকাশ করা যায় না, কাছাকাছি বানান হলেই যথেষ্ট। 'মেইন, চেইন' ইত্যাদি লিখলে লোকে ই-কারের উপর অতিরিক্ত জোর দেয়। আর একটি ভয়ংকর বানান মাঝে মাঝে দেখি— 'কেইক' অর্থাৎ কেক। ই-কার না দিলে কি 'ক্যাক' পড়বার ভয় আছে?

১৮৭৯

আচার্য উপাচার্য

কালক্রমে অনেক শব্দের মানে বদলায়। সংস্কৃত অভিধানে যেসব অর্থ পাওয়া যায় আধুনিক বাঙলা প্রয়োগে বহু ক্ষেত্রে তার অল্পাধিক পরিবর্তন হয়েছে। পাঠশালা আর বিদ্যালয় এই দুইএর মূল অর্থ একই, কিন্তু আজকাল মানে বদলে গেছে। সেই রকম— বৈদ্য ও চিকিৎসক, ঘটনা ও যোজনা, অভ্যর্থনা ও প্রার্থনা, প্রণাম ও নমস্কার। অনেক শব্দের অর্থব্যাপ্তি (connotation) পূর্ববৎ নেই, যেমন, সাহিত্য-এর অর্থ প্রসারিত হয়েছে, কাব্য-এর অর্থ সংকুচিত হয়েছে। ধাতু বললে সাধারণ শিক্ষিত লোকে বোঝে metal, কিন্তু কবিরাজরা প্রাচীন অর্থ অনুসারে অধিকন্তু বোঝেন হরিতাল হিঙ্গুল প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ এবং রক্ত মাংস প্রভৃতি দৈহিক উপাদান।

একালের রাষ্ট্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সেকালের মতন নয়, সেজন্য অনেক শব্দের প্রাচীন অর্থ কিছু না বদলালে আমাদের আধুনিক প্রয়োজন মেটে না। কিন্তু মূল অর্থের সঙ্গে নূতন অর্থের ভাবগত বিরোধ যাতে না হয় তা দেখা দরকার। স্নাতক-এর একটি প্রাচীন অর্থ—বিদ্যাশিক্ষান্তে যে ব্রহ্মচর্যসমাপ্তিসূচক স্নান করেছে। সমাবর্তন-এর অর্থ—ব্রহ্মচর্যের অন্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ। আজকাল এই দুই শব্দ গ্র্যাজুএট ও কনভোকেশন অর্থে চলছে। এতে আপত্তির

কারণ নেই। কিন্তু নাচ-গানের স্কুলকে বিদ্যালয় বলা গেলেও পাঠশালা বলা চলবে না, সেখানকার শিক্ষককেও গুরুমশায় বা অধ্যাপক বলা চলবে না।

কুলপতি শব্দের আভিধানিক অর্থ— যে বিপ্রর্ষি দশসহস্র মুনিকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন। যেমন অক্ষৌহিণী শব্দের বিবৃতিতে ৬৫,৬১০ অশ্ব, ২১,৮৭০ গজ ইত্যাদির উল্লেখ আছে তেমনি কুলপতির বিবৃতিতে ১০,০০০ শিক্ষার্থী মুনির উল্লেখও পৌরাণিক সংখ্যান ধরা যেতে পারে। দশ সহস্র শিষ্যের মানে অনেক শিষ্য, দু-এক হাজার বা দু-পাঁচ শও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর কুলপতি ছিলেন— একথা বললে প্রাচীন অর্থের অপলাপ হবে মনে করি না।

মনুর বচন অনুসারে আচার্য শব্দের অর্থ— যে দ্বিজ শিষ্যকে উপনীত করে বেদাঙ্গ ও উপনিষৎ সমেত বেদ শিক্ষা দেন। আপ্তের অভিধানে আচার্য-এর একটি অর্থ দেওয়া আছে— (when affixed to proper names) learned, venerable (somewhat like the Eng. Dr)। এই সব অর্থের কালোচিত পরিবর্তন করলে রবীন্দ্রনাথের আচার্য উপাধিও সার্থক। গুরু আর আচার্য প্রায় সমার্থক, সেজন্য তাঁর গুরুদেব উপাধিও সার্থক।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আর বিশ্বভারতীর শুধু প্রতিষ্ঠাতা নন, বহুকাল স্বয়ং অধ্যাপনা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র

শিক্ষার বিধায়ক ছিলেন। এ কারণে আচার্য উপাধি সর্বতোভাবেই তাঁর উপযুক্ত। বিশ্বভারতী এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে, তার চান্সেলর নেহরুজী দিল্লিতে থাকেন, কালেভদ্রে বিশেষ উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে, প্রশাসন বা administration সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে তাঁর সম্মতি নিতে হয়। কোন স্কুল বা কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেণ্টকে আচার্য বা অধ্যাপক বললে যে দোষ হয়, বিশ্বভারতীর চানসেলরকে আচার্য বললেও সেই দোষ হয়। বিশ্বভারতী বা কলিকাতা বা অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের চানসেলরের পদে যিনি অধিষ্ঠান করেন তিনি রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রী বা রাজ্যপাল যাই হন, তাঁকে আচার্য বলা নিতান্ত অসংগত। চানসেলর আর আচার্য এই দুই শব্দের অর্থগত বা ভাবগত সাদৃশ্য কিছুমাত্র নেই।

কলেজের প্রিনসিপাল অধ্যাপনাও করতে পারেন কিন্তু অধ্যাপনার উপর গুরুত্ব না দিয়ে তাঁকে শুধু প্রাধান্যসূচক পদবী দেওয়া হয়েছে, কারণ, তিনি অধ্যাপকবর্গের প্রধান এবং পরিচালক। প্রিনসিপাল-এর প্রতিশব্দ অধ্যক্ষও প্রাধান্য- ও কর্তৃত্ব-সূচক। Concise Oxford Dictionaryতে *university* Chancellor-এর অর্থ—titular head with Vice-c. acting অর্থাৎ, চানসেলর পদবীতে প্রধান হলেও ভাইসচানসেলরই প্রকৃত কর্তা। চানসেলরের যা অধিকার তা প্রশাসন বা ব্যয়-অনুমোদন সংক্রান্ত, তাঁকে আচার্য বলার পক্ষে কিছুমাত্র যুক্তি নেই।

ভাইসচানসেলরকে উপাচার্য বলা আরও আপত্তিজনক। ইংরেজী ভাইস-এর অন্ধ অনুকরণে বাঙলায় উপ- উপসর্গের প্রয়োগ একবারে নিরর্থক। ভাইসচানসেলর ইচ্ছা করলে অধ্যাপনা করতে পারেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃত কর্ম প্রশাসন বা পরিচালন। ইংরেজী নামে ভাইস- উপসর্গ সত্ত্বেও তিনি কারও স্থানাভিষিক্ত বা সহকারী নন। উপাচার্য শুনলে মনে আসে assistant professor। এই উপাধি তাঁর শুধু অযোগ্য নয়, মর্যাদাহানিকরও বটে।

সরকারী কার্যের পরিভাষা সংকলনের জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার একটি সমিতি নিযুক্ত করেছিলেন। এই সমিতির সংকলিত তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কয়েকটি পরিভাষা আছে, যেমন— Senate অধিষদ্, Syndicate নিষদ্, Registrar নিবন্ধক, Vice-chancellor অধিপাল, Chancellor মহাধিপাল। (এই সংজ্ঞাগুলির রচয়িতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য এম-এ কাব্যসাংখ্যপুরাণতীর্থ)। কলেজের প্রধান যেমন অধ্যক্ষ, সরকারী বিভাগের ডিরেক্টর যেমন অধিকর্তা, কোনও সংঘের প্রধান নেতা বা নিয়ন্তা যেমন অধিনায়ক, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি প্রধান নিয়ন্তা তিনি অধিপাল।

একালের ভাইসচানসেলর (বিশেষত বিশ্বভারতীর তুল্য আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের) সেকালের কুলপতিরই সমপর্যায়ের। অধিপাল উপাধিতে তাঁর অধিনায়কত্ব ও পদোচিত গৌরব সূচিত

হয়। চানসেলরকে আচার্য আখ্যা না দিয়ে মহাধিপাল বললে তাঁরও যথোচিত মর্যাদা বজায় থাকে।

১৮৭৯

স্বাধীনতার স্বরূপ

স্বাধীন আর পরাধীন দেশের প্রভেদ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই বলবেন, দেশের লোকেই যেখানে শাসন করে সে দেশ স্বাধীন, বিদেশী যেখানে শাসন করে তা পরাধীন। কিন্তু এত সহজে প্রশ্নটির মীমাংসা হয় না। দেশের কত জন স্বাধীন, কতটা স্বাধীন, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে স্বাধীন, ইত্যাদি নানা বিষয় বিচার করা দরকার।

স্বাধীনতার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ— নিজের ইচ্ছায় চলবার অর্থাৎ যা ইচ্ছা তাই করবার ক্ষমতা এ রকম নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কোনও দেশের কোনও লোকের নেই, সর্বশক্তিমান ডিকটেটারেরও নেই। সকল রাষ্ট্রেই নাবালক, পাগল, জেলখানার কয়েদী ইত্যাদির স্বাধীনতা অল্প। প্রাচীন স্বাধীন ভারতে স্ত্রী আর শূদ্রের অনেক অধিকার ছিল না, ব্রাহ্মণ গুরু পাপে লঘু দণ্ড পেত, কিন্তু অব্রাহ্মণ নিষ্কৃতি পেত না। কমিউনিস্ট দেশের প্রজার স্বাধীনতা অতি সীমাবদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যাগুরু অশ্বেতজাতির অনেক অধিকার নেই। বিলাতে ১৯২০ সালের আগে রোমান ক্যাথলিক প্রজার পূর্ণ অধিকার ছিল না, ১৯১৮ সালের আগে মেয়েদের ভোট ছিল না। ব্রিটিশ আমলে ভারতের প্রজা বিনা বাধায় প্রচুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে পারত, কিন্তু সমাজতন্ত্রী স্বাধীন ভারতে সেই অধিকার সংকুচিত

হয়েছে। বর্তমান ব্রিটিশ এবং আরও অনেক ইওরোপীয় রাষ্ট্রের অবস্থাও এই রকম। মোট কথা, প্রজার পক্ষে স্বাধীন আর পরাধীন দুই দশাই আপেক্ষিক বা relative।

আমরা বলে থাকি, তুর্ক জাতি অর্থাৎ পাঠান-মোগল কর্তৃক ভারত বিজয়ের পর থেকে ১৯৪৭ সালের অগস্ট পর্যন্ত মোটা-মুটি ৭০০ বৎসর ভারত পরাধীন ছিল। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, মুসলমান বিজেতারা ভারতে স্থায়ী ভাবে বসতি করেছিল এবং এদেশের বিস্তর লোক মুসলমান হয়ে বিজেতাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, এই কারণে বাদশা-নবাবদের বিদেশী বলা ঠিক নয়, তাঁদের রাজত্বকালে ভারত পরাধীন ছিল এ কথাও বলা চলে না। এঁদের যুক্তি অনুসারে কেবল ব্রিটিশ অধিকারেই ভারত পরাধীন ছিল। এ দেশের মুসলমানরাও মনে করে, বাদশাহী আর নবাবী আমলে তাদের স্বাধীনতার হানি হয় নি।

আলোচ্য বিষয়টি কি রকম জটিল তা আরও কয়েকটি দেশের ইতিহাস থেকে জানা যাবে। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নরমাণ্ডির ডিউক উইলিয়ম যখন ইংলাণ্ড আক্রমণ করে জয়ী হন তখন ইংরেজ জাতি নিশ্চয় পরাধীন হয়েছিল। তার পর শতাধিক বৎসর নরমান অভিজাত বর্গের সর্বময় কর্তৃত্বের সময় দেশের অধিবাসী অ্যাংলোস্যাকসনরা অধীনতার দুঃখ ভাল করেই ভোগ করেছিল। কিন্তু সেই পরাধীন দশা ক্রমে ক্রমে আপনিই বিলীন হয়ে গেল। বিজেতা আর বিজিতদের মধ্যে ভাষাগত ভেদ ছিল, কিন্তু বর্ণগত ধর্মগত আর আচারগত ভেদ ছিল না,

সেজন্য নরমান আর অ্যাংলোস্যাকসন শীঘ্রই সম্পূর্ণভাবে মিশে গেল। সুতরাং এ কথা বলা চলে যে নরমান বিজয়ের পর ইংলাণ্ড দু-এক শ বৎসর মাত্র পরাধীন ছিল।

সপ্তম শতাব্দে ইসলামের উৎপত্তির সময় মিসর পারস্য তাতার প্রভৃতি স্বাধীন ছিল, কিন্তু কয়েক শ বৎসরের মধ্যেই মুসলমান খলিফা এবং আরব যোদ্ধারা এই সব দেশ জয় করে করে নিজের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। দেশের লোক বিজিত হল, কিন্তু ধর্মান্তরিত হয়ে বিজেতাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে সাযুজ্য লাভ করল, তাদের পরাধীনতার কলঙ্ক আর রইল না।

মুসলমান বিজয়ের এইপ্রকার পরিণাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটলেও কয়েকটি দেশে ব্যতিক্রম দেখা গেছে। স্পেন, সিসিলি, বলকান প্রদেশের কতক অংশ আর ভারতবর্ষ বিজিত হয়েও পুরোপুরি ধর্মান্তরিত হয় নি। স্পেন সিসিলি ইত্যাদি কয়েক শ বৎসরের মধ্যেই বিজেতার কবল থেকে মুক্ত হয়েছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ তা পারে নি। কুবলাই খাঁ আর তাঁর উত্তরাধিকারীরা অনেক বৎসর চীন দেশে রাজত্ব করেছিলেন এবং নিজেরাই বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

এ কালে ভারতে যে দেশাত্মবোধ আর সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে সেকালে তা ছিল না। ভারতবাসী বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, আপৎকালেও তাদের ঐক্য ঘটে নি, আক্রামক জাতিদের মতন তারা যুদ্ধনিপুণ ছিল না, তাদের নীতি যদ্ভবিষ্য তদ্ভবিষ্য। এই সব কারণে ভারত পরাধীন হয়েছিল।

ভারতী প্রজা চিরকাল ঝঞ্ঝাট পরিহার করেছে, ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে থেকে চিরাগত ধর্ম আর সমাজবিধি পালন করতে পারলেই কৃতার্থ হয়েছে, রাজা যেই হক তাতে তার বিশেষ আপত্তি ছিল না।

নরমান বিজয়ের পর ইংলাণ্ডের এবং মুসলমান বিজয়ের পর মিসর পারস্য প্রভৃতির সর্বাঙ্গীণ পরাধীনতা ঘটেছিল এবং মিশ্রণের ফলে কয়েক শ বৎসরের মধ্যে তা তিরোহিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতের পরাধীনতা আংশিক, অর্থাৎ শুধু রাজনীতিক, অত্যাচারিত হয়েও দেশের অধিকাংশ লোক তাদের ধর্মগত আর সমাজগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিল। বহুবর্ষব্যাপী নিশ্চেষ্টতার মধ্যেও ভারতবাসীর একটি বিষয়ে দৃঢ়তা ছিল, সে তার 'সহজং কর্ম (বা ধর্ম) সদোষমপি' ত্যাগ করে নি। সমগ্র ভারত যদি পরধর্ম গ্রহণ করত তবে আমাদের পরাধীন দশার স্থিতি সাত শ বৎসর না হয়ে দু শ বৎসর গণ্য হত, অর্থাৎ শুধু ব্রিটিশ অধিকার কাল। সে ক্ষেত্রে সমস্ত মুসলমানের সঙ্গে সাজাত্য অনুভব করে কবি ইকবালের মতন আমরাও হৃত রাজ্যের জন্য বিলাপ করতাম— চীন হমারা, স্পেন হমারা।

অন্য বিষয়ে উদ্যমহীন হয়েও ভারতবাসী তার দৃঢ় স্বধর্মনিষ্ঠা কোথা থেকে পেয়েছে? কেউ কেউ বলবেন, এর মূলে আছে বর্ণাশ্রম ধর্ম। কিন্তু যথার্থ বর্ণাশ্রম আর চাতুর্বর্ণ্য বহুকাল আগেই লোপ পেয়েছে, তার স্থানে যা এসেছে তা জাতিভেদ বা casteism। এই শতমুখী ভেদবুদ্ধির এমন শক্তি থাকতে

পারে না যার দ্বারা বিজেতার ধর্মকে বাধা দেওয়া যায়। ভারতবাসীর প্রকৃতিতে এক প্রকার প্রবল জাড্য বা inertia আছে, সে অজ্ঞাতসারে অনেক পরিবর্তন মেনে নেয় কিন্তু সজ্ঞানে তার নিষ্ঠা ত্যাগ করতে চায় না। হয়তো এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই বহিরাগত আঘাত প্রতিহত হয়েছিল। পেগান গ্রীস আর রোমের সংস্কৃতি প্রচুর ছিল, তথাপি সেখানকার লোকে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছিল। ভারতের অসংখ্য ধর্মমত আর লোকাচারের মধ্যে এমন কিছু বলিষ্ঠ অবলম্বন আছে যার কাছে বিদেশীর প্রভাব হার মেনেছিল। ইতিহাসজ্ঞ সমাজবিজ্ঞানীরা হয়তো তার সন্ধান পেয়েছেন।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। পাঁচ শ বৎসরের মুসলমান শাসনের ফলে ভারতবাসীর সংস্কৃতি অবশ্যই কিছু বদলেছে। কিন্তু তার চাইতে বহুগুণ বদলেছে দু শ বৎসরের ব্রিটিশ শাসনে। মুসলমান সংস্কৃতি থেকে গ্রহণযোগ্য বেশী কিছু আমরা পাই নি, কিন্তু ব্রিটিশ বা ইওরোপীয় সংস্কৃতি থেকে প্রচুর পেয়েছি। আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম নেবার প্রয়োজন বোধ করি নি, কিন্তু ইওরোপীয় আচার কিছু কিছু আত্মসাৎ করেছি এবং সাগ্রহে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা বুদ্ধি ও ভাবধারা অজস্র পরিমাণে বরণ করে নিয়েছি।

১৮৭৯

আমিষ নিরামিষ

মথুর মুখুজ্যে সকালবেলা পার্কে বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর বাল্যবন্ধু অঘোর দত্তের সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হয়ে গেল। দুজনে একটা বেঞ্চিতে বসলেন। মথুরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তার পর, আছ কেমন? বয়স কত হল?

অঘোর দত্ত বললেন, ভাল মন্দ মিশিয়ে আছি, নালিশ করবার কিছু নেই। বয়স প্রায় আটাত্তর হল।

মথুর। আমার পঁচাত্তর, কিন্তু ভাল নই দাদা। বাত হাঁপানি ডিসপেপসিয়া, নানানখানা। আচ্ছা তুমি তো নিরামিষ খাও। কত দিন খাচ্ছ?

অঘোর। তা ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর, ছেলেবেলা থেকেই।

মথুর। বল কি হে! সেই জন্যই এখন পর্যন্ত বেশ আছ। আমিও ভাবছি মাছ মাংস ছেড়ে দেব। আর কেন, ঢের খেয়েছি, শেষ বয়সে সাত্ত্বিক আহারই ভাল। নিরামিষভোজীরা দীর্ঘজীবী হয়, আনি বেসাণ্ট, বার্নার্ড শ, গান্ধীজী—

অঘোর। ভুল করলে ভাই। আমিষ খেয়েও বিস্তর লোক আশি পেরিয়ে বেঁচে আছেন, যেমন চার্চিল, ফজল হক, হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ। যোগেশ বিদ্যানিধি মশাই তো ছেয়ানব্বই পার হয়ে বার্নার্ড শকেও হারিয়ে দিয়েছেন।

এমন সময় ফণী মল্লিক এসে পড়লেন। এঁর বয়স প্রায়

ষাট, বহু কাল আগে একবার বিলাত গিয়েছিলেন, তার লক্ষণ সাজে আর চালচলনে এখনও কিছু দেখা যায়। মথুরবাবু বললেন, আসতে আজ্ঞে হক মল্লিক সায়েব, বসুন এইখানে। এই অঘোর দত্তকে চেনেন তো ? অদ্ভুত মানুষ, পঁয়ষট্টি বৎসর নিরামিষ খেয়ে বেঁচে আছেন। আচ্ছা মল্লিক মশাই, আপনি তো বিচক্ষণ জ্ঞানী লোক, আমিষ নিরামিষ আহার সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

ফণী মল্লিক বললেন, প্রচুর আমিষ খাওয়া উচিত, আমিষের অভাবেই হিন্দু জাতির অধঃপতন হয়েছে।

মথুর। আচ্ছা অঘোর, তোমার তো কোনও কালেই ধর্মে তেমন মতি দেখি নি। তবে মাছ মাংস খাও না কি কারণে ?

অঘোর। যে কারণে তুমি সাপ ব্যাঙ খাও না।

মথুর। ও একটা বাজে কথা। যদি বলতে অহিংসার জন্য বা স্বাস্থ্যের জন্য খাও না, কিংবা শাস্ত্রমতে প্রশস্ত নয় তাই খাও না তা হলে বুঝতাম।

অঘোর। আমরা যা করি সব কিছুরই কি কারণ বলা যায় ? যা বলেছি তার সোজা অর্থ— তোমার যেমন সাপ ব্যাঙে রুচি হয় না আমার তেমনি মাছ মাংসে হয় না। যদি জেরা কর কেন রুচি হয় না, তবে ঠিক উত্তর দিতে পারব না। হয়তো পাকযন্ত্রের গড়ন এমন যে আমিষ সয় না কিংবা পুষ্টির জন্য দরকার হয় না। হয়তো ছেলেবেলায় এমন পরিবেশে ছিলাম বা এমন কিছু দেখেছিলাম শুনেছিলাম বা পড়েছিলাম

যার প্রভাব স্থায়ী হয়ে আছে। যদি নিরামিষ সহ্য না হত তবে নিশ্চয় আমিষ ধরতাম, যেমন অক্ষয়কুমার দত্ত শেষ বয়সে রোগে পড়ে ধরেছিলেন। আমি কিন্তু পুরোপুরি ভেজিটেরিয়ান নই। দুধ খাই, যা হচ্ছে খাঁটী গোরস, আর মাঝে মাঝে চিকিৎসার জন্য জান্তব ঔষধও খেতে বা ইনজেকশন নিতে হয়েছে।

ফণী মল্লিক সহাস্যে বললেন, হুঁ, এইবার পথে আসুন। এক মার্কিন ভদ্রলোক এচ. জি. ওয়েল্‌সকে বলেছিলেন, আপনাদের বার্নার্ড শ একজন ক্ষণজন্মা জ্ঞানী সাধুপুরুষ, নিরামিষ খেয়েই এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মস্তিষ্ক চালনা করছেন। ওয়েল্‌স হেসে বললেন, নিরামিষ না ছাই। দুধ খাচ্ছেন, চীজ খাচ্ছেন, ডিম খাচ্ছেন, আবার প্রতিদিন লিভার এক্সট্রাক্ট ইনজেক্‌শন নিচ্ছেন, যা হল রক্তমাংসের সারাৎসার। শুনুন মথুরবাবু, মাছ মাছ মাংস ডিম খেলে যত সহজে পুষ্টি আর শক্তিলাভ হয়, তেমন আর কিছুতে হয় না। জনকতক ভাত ডাল শাগ তরকারি খেয়ে দীর্ঘজীবী হতে পারে, কিন্তু অ্যাভারেজ লোকের পক্ষে আমিষ বর্জন অনিষ্টকর। যার প্রচুর দুধ ক্ষীর ছানা খাবার সামর্থ্য আছে তার হয়তো চলে যেতে পারে, কিন্তু সকলের পক্ষে আর সকল জায়গায় তা সুলভ নয়।

মথুর। কিন্তু শুনেছি মাংস খেলে হিংসাবৃত্তি প্রবল হয়। এই দেখুন না, এদেশে যারা মাংসখোর তারাই দাঙ্গাবাজ আর একটুতে ছোরা মারে।

ফণী। মারবেই তো, অন্য পক্ষ যে নিস্তেজ ভীরু। মুখুজ্যে মশাই, আমাদের যে মাইল্ড হিন্দু বলে খ্যাতি আছে তা মোটেই গৌরবের নয়। আমাদের একটু উগ্র হওয়া দরকার। ভারতীয় আর্যজাতির ইতিহাস দেখুন। রাম লক্ষ্মণ সীতা বনে গিয়ে মাংস খেয়েই জীবনধারণ করতেন। চিত্রকূট আর দণ্ডকারণ্যের জঙ্গলে চাল ডাল আটা পাবেন কোথা? পেলে অবশ্য ফলমূলও খেতেন, কিন্তু সেটা তাঁদের প্রধান খাদ্য ছিল না, শুধু ভাইটামিন-সি-এর জন্য খেতেন। বনবাসী পাণ্ডবরাও তাই করতেন। তাঁরা এত হরিণ মারতেন যে সেখানকার ঋষিরা তাঁদের অন্যত্র চলে যেতে বলেছিলেন। আমাদের মাংসাশী পূর্বপুরুষরা তেজস্বী মহাবীর যুদ্ধবিশারদ ছিলেন, আবার বেদ-বেদান্তও রচনা করেছেন। তাঁদের বংশধররা বৌদ্ধ আর জৈনদের নকলে নিরামিষভোজী হয়েই অধঃপাতে গেছে।

মথুর। অঘোর, তুমি কি বল? মাংসাহার আসুরিক নয় কি? তাতে কাম ক্রোধ লোভাদি রিপু আর হিংস্রতা প্রবল হয় না কি?

অঘোর। ঠিক বলতে পারি না। নিরামিষাশী গণ্ডার মোষ আর ষাঁড়ের ক্রোধ নেহাত কম নয়। বাঁদর আর ছাগলের প্রথম রিপু বাঘ সিংগির চাইতে প্রবল। শুনেছি হিটলার নিরামিষ খেতেন, কিন্তু অহিংস হতে পারেন নি। আমিষাশী লোকের তুলনায় নিরামিষাশীর সংযম হয়তো মোটের উপর কিছু বেশী, কিন্তু তার কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই।

চুরি জুয়াচুরি ভেজাল কালোবাজার লাম্পট্য ইত্যাদি নানারকম দুষ্কর্ম আমাদের দেশের নিরামিষখোরদের মধ্যে কিছুমাত্র কম নয়। এদেশের অনেক লোক গরুকে মাতৃজ্ঞান করে, বাঁদরকে ভ্রাতৃজ্ঞান করে, কিন্তু গোখাদক শিকারপ্রিয় পাশ্চাত্ত্য জাতিদের তুলনায় আমাদের জন্তুপ্রীতি মোটের উপর কম। নিরামিষ ভোজন বেশী হিতকর কি না তার পরীক্ষা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত হয় নি। যদি শ-খানিক শিশুকে একই পরিবেশে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত রাখা হয় এবং তাদের পঞ্চাশ জনকে আমিষ আর পঞ্চাশ জনকে নিরামিষ খাওয়ানো হয় তবে তাদের স্বাস্থ্য আর চরিত্রের গড়পড়তা প্রভেদ দেখে খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করা যেতে পারে। তবে এ কথা ঠিক যে আধুনিক খাদ্য-বিজ্ঞানীরা বেশী মাংস খাওয়ার নিন্দা করেন, আমিষ-নিরামিষ মিশ্রিত খাদ্যই ভাল মনে করেন।

ফণী। আমিও মানি যে মিশ্রিত আহারই ভাল। কিন্তু খাদ্যবিজ্ঞানীরা শুধু বেশী মাংস খাওয়ার নিন্দা করেন না, অতিরিক্ত স্টার্চ মিষ্টান্ন আর তেল ঘিও অনিষ্টকর বলেন। আমরা বাঙালীরা যা খাই তাতে মাছ মাংসের মাত্রা নিতান্তই কম। এদেশে নদীবহুল অঞ্চলে আর সমুদ্রের উপকূলে বিস্তর মাছ পাওয়া যায়, সেই বিধিদত্ত খাদ্য না খাওয়া ঘোরতর বোকামি। মাছ পাঁঠা মটন ডিম আমাদের নিষিদ্ধ খাদ্য নয়, মুরগিও জাতে উঠেছে, আজকাল পোর্ক আর বীফেও অনেকের আপত্তি নেই। এখন দরকার যেমন করে হক আহারে

আমিষের মাত্রা বাড়ানো। আমরা যদি আহার বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য জাতিদের সমান না হই তবে জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে যাব। কূপমণ্ডুক হয়ে সনাতন বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ থাকার দিন চলে গেছে। আমাদের এখন নানা উপলক্ষ্যে দেশবিদেশে যেতে হয়, এ খাব না ও খাব না বলে আবদার করলে চলবে না। সভ্য মানুষের পোশাক যেমন প্রায় এক ধরনের হয়ে পড়েছে, সভ্য মানুষের খাদ্যও তেমনি ইউনিভার্সাল হওয়া দরকার। অঘোরবাবু যে সাপ ব্যাঙের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন তা অত্যন্ত কুযুক্তি। সাপ ব্যাঙে রুচি না হবারই কথা, কিন্তু সভ্য লোকে সর্ব দেশে যা খায় তার উপর ঘৃণা থাকা সুরুচির পরিচয় নয়।

অঘোর। সাপ ব্যাঙ শুওর গরু ছাগল ভেড়া কোনওটার উপর আমার ঘৃণা নেই, সবাই কৃষ্ণের জীব। সায়েবদের যেমন কাঁঠাল কয়েতবেল আর টোপাকুলের গন্ধ সয় না, আমারও তেমনি আমিষের গন্ধ সয় না। নিজে খাই না, কিন্তু যারা খায় তাদের রুচির নিন্দা করি না। মল্লিক মশাই, আপনি রামায়ণ মহাভারত থেকে উদাহরণ দিয়েছেন। দয়া করে আর একটু পশ্চাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন। আমাদের পূর্বপুরুষ অতিপ্রাচীন মানবজাতি কি খেয়ে জীবনধারণ করত? যখন পশুপালন আর কৃষিকর্ম জানা ছিল না তখন মানুষ শুধু শিকার করা জন্তু নয়, সাপ ব্যাঙ ইঁদুর টিকটিকি শামুক গুগলি ফড়িং পোকা, মায় নর-মাংস, যা জুটত তাই খেত। পাওয়া গেলে ফলমূলও খেত,

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক সত্য মানতে হবে যে প্রায় সকল প্রাণীই মানুষের ভক্ষ্য হতে পারে, কিন্তু সকল উদ্ভিদ নয়। পশুপক্ষি-পালন শেখার পর মানুষ পালিত জন্তুর মাংস দুধ ডিম খেতে শুরু করল। তার পর কৃষির প্রচলন হলে নানারকম শস্য উৎপন্ন হতে লাগল, খাদ্যের বৈচিত্র্য বেড়ে গেল। মানুষের রুচি কালে কালে বদলায়, এক শ বছর আগে আমরা যা খেতাম এখন ঠিক তা খাই না। মোট কথা, আমাদের অতিপ্রাচীন পূর্বপুরুষদের সাপ ব্যাঙ পোকামাকড়ে বিলক্ষণ রুচি ছিল, তার পর ক্রমশ রুচি বদলেছে, আধুনিক সভ্য মানুষ নানা রকম আমিষ নিরামিষ খেতে শিখেছে, সেকালের অনেক খাদ্যের উপর বিতৃষ্ণাও জন্মেছে। কিন্তু এখনও অসভ্য আর অর্ধসভ্য জাতি আছে যাদের সাপ ব্যাঙ ইঁদুর পোকায় আপত্তি নেই।

ফণী। আদিম মানুষ কি খেত আর একালের অসভ্য মানুষ কি খায় তা আমাদের দেখবার দরকার নেই। আমার বক্তব্য আধুনিক সভ্য সমাজে যা খুব চলে তাই আমাদের খেতে হবে।

অঘোর। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কতকগুলি প্রাণীর মাংস ডিম দুধ আর বাছা বাছা শস্য তরকারি ফল মূল। হিন্দুর লোকাচার অনুসারে মাছ ছাগল ভেড়া হরিণ হাঁস ইত্যাদি কয়েকটি প্রাণীর মাংস শুদ্ধ। শাস্ত্রে পাঁচটি পঞ্চনখ জন্তু খাবার বিধানও আছে— খরগোশ শজারু গোসাপ গণ্ডার আর কচ্ছপ। এখন নতুন ফর্দ করতে হবে, সায়েবরা যা খায় অর্থাৎ গরু শুওর ইত্যাদিও খেতে হবে। পোর্ক আর

বীফ দুর্মূল্য হওয়ায় পাশ্চাত্ত্য দেশে আজকাল ঘোড়া আর তিমি অর্থাৎ হোয়েলের মাংসও চলছে। সায়েবরা ব্যাঙের ঠ্যাং আর ঝিনুকের কাঁচা শাঁসও অতি সুস্বাদু মনে করে। অতএব এ সবেও আপত্তি করা চলবে না। মল্লিক মশাই, এই তো আপনার মত ?

ফণী। হাঁ, তবে সায়েব বললে ঠিক হবে না, বলুন আধুনিক সুসভ্য জাতিরা।

অঘোর। সুসভ্য জাতিদের মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞতম আর দূরদর্শী তাঁরা বুঝেছেন যে অভ্যস্ত বাছাবাছা খাদ্যের উপর একান্ত নির্ভর ভাল নয়। দরকার হলে অনভ্যস্ত খাদ্যও খেতে হবে, যাতে পুষ্টি হয় আর স্বাস্থ্যহানি হয় না। পুরাণে আছে, দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্বামিত্র সপরিবারে কুকুরের মাংস খেতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আধুনিক যুগে যুদ্ধ বা আবিষ্কার ইত্যাদির অভিযানে অবস্থা বিশেষে অনভ্যস্ত খাদ্যও খাবার দরকার হতে পারে। সম্প্রতি বিলাতে আর ফ্রান্সে জনকতক ভলনটিয়ারকে কিছুদিনের জন্য এমন জায়গায় নির্বাসিত করা হয়েছিল যেখানে মামুলী খাদ্য মোটেই মেলে না। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, ফল মূল পাতা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মাছ ব্যাঙ শামুক গুগলি যা জোটে তাই কাঁচা খেয়ে জীবনধারণ করতে হবে। তারা ফিরে এলে দেখা গেল যে তাদের কিছুমাত্র স্বাস্থ্যহানি হয় নি। আমাদের দেশেও ওই রকম আপৎকালীন আহারের অভ্যাস হওয়া দরকার।

মথুর। দেখ অঘোর, তুমি একটি ভণ্ড। নিজে নিরামিষ খাও অথচ মল্লিক মশাইকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছ। তুমি কি বলতে চাও, সাপ ব্যাঙ পোকা মাকড় খেতে না শিখলে আমাদের নিস্তার নেই ?

ফণী। অঘোরবাবু আমার লেগ পুল করছেন।

অঘোর। আজ্ঞে না। আপনি অনেক সারগর্ভ কথা বলছেন, আমি শুধু আপনার যুক্তি আর একটু ফলাও করবার চেষ্টা করছি।

মথুর। আচ্ছা মল্লিকমশাই, আমিষ খাদ্য খুব পুষ্টিকর তা তো বুঝলাম। কিন্তু অহিংসা হচ্ছে পরম ধর্ম, অতএব কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যহানি মেনে নিয়েও নিরামিষাশী হওয়া উচিত নয় কি ? প্রাচীন যুগের অবস্থা যাই হক, ঈশ্বরকৃপায় এখন যখন চাল ডাল গম তরকারি আর কিছু কিছু দুধও জুটছে, আর মাছ মাংসের বাজারও আগুন, তখন নিরামিষ খাওয়াই আমাদের উচিত, এই কি ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয় ?

ফণী। ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি তা জানবেন কি করে ? সকলেই অহিংস হবে আর নিরামিষ খাবে এই যদি সৃষ্টিকর্তার মতলব হত, তবে তিনি বাঘ সিংগি বেরাল প্রভৃতি জানোয়ার সৃষ্টি করতেন না, সব জন্তুকেই গরু ছাগলের মতন নিরামিষাশী করতেন। পৃথিবীতে বিস্তর প্রাণী আছে যারা বিধাতার বিধানেই আমিষাশী হয়েছে, হিংসার পাপ তাদের স্পর্শ করে না। মানুষকেও সেই দলে ফেলবেন না কেন ?

অঘোর। কিন্তু মানুষ শুধু আমিষ খায় না, লাউ কুমড়ো আম কাঁঠালও খায়। বিধাতা আমাদের বাঘ সিংগির দলে ফেলেন নি, বরং বলতে পারেন, ভালুক শেয়াল ইঁদুর কাগ প্রভৃতি সর্বভুক জানোয়ারের দলে ফেলেছেন।

ফণী। এ কথায় আমার আপত্তি নেই।

অঘোর। আরও একটা কথা। বিধাতা আমাদের এমন বুদ্ধিও দিয়েছেন, যাতে চিরাভ্যস্ত খাদ্য বদলাতে পারি।

মথুর। তাইতো, বিষয়টা বড়ই গোলমেলে ঠেকছে। তোমরা দুই তার্কিকে মিলে আমার মাথা গুলিয়ে দিলে।

অঘোর। শোন মথুর, এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামিও না, কূল কিনারা পাবে না। শাস্ত্রে আছে, যাতে জীবের অত্যন্ত হিত হয়, তাই ধর্ম। কিন্তু মুশকিল এই, বেরালের যা হিত ইঁদুরের তা নয়, মশা মাছি ছারপোকার যা হিত মানুষের তা নয়। অহিংসা পরম ধর্ম, কিন্তু তা পুরোপুরি মেনে চলা আমাদের অসাধ্য। আমিষাহার না হয় বর্জন করা গেল, কিন্তু আরও অনেক নিষ্ঠুর কর্ম আমরা চোখ বুজে করে থাকি। ষাঁড়কে নপুংসক করে বলদ বানিয়ে নাকে দড়ি দিয়ে খাটাই। কোটি কোটি পোকা মেরে পবিত্র আর শৌখিন এণ্ডি গরদ তসর তৈরি করি, তুচ্ছ শখের জন্য পাখিকে খাঁচায় পুরি, নানা জন্তুর স্বাধীনতা হরণ করে জুএ বন্দী করি, পোলিও-ভ্যাকসিন তৈরির জন্য হাজার হাজার বাঁদর চালান দিই, তাদের বধ করা হবে জেনেও। এসব কি জীবহিংসা নয়? আমাদের স্বভাব হঠাৎ

বদলানো যাবে না। আমিষাহার অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, শাস্ত্রে তার নিন্দা থাকলেও বারণ নেই। মনুর সেই বচনটি জানো তো? 'ন মাংসভক্ষণে দোষো' ইত্যাদি। 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং' — লোকের প্রবৃত্তিই এই রকম, 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'— তবে ছাড়তে পারলে মহা ফললাভ। আমাদের দেশের অনেক মহাপুরুষ মাংসাহার সমর্থন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গৌরদাস বাবাজীকে দিয়ে বলিয়েছেন, 'বাপু, ভগবান কোথায় বলেছেন যে পাঁঠা খাইও না?…পদ্মপুরাণ খোল, দেখাইব যে মাংস দিয়া বিষ্ণুর ভোগ দিবার ব্যবস্থা আছে।' বিবেকানন্দ মাংস-ভোজন আবশ্যক বলেছেন। এদেশের যেসব সম্প্রদায় বংশানুক্রমে নিরামিষাশী ছিল, তাদেরও অনেকে আজকাল আমিষ খাচ্ছে, আধুনিক ভারতে নিরামিষভোজী কমছে, আমিষভোজী বাড়ছে।

মথুর। তবে কি তোমরা বলতে চাও আমিষ না খাওয়াই দোষের?

ফণী। তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

অঘোর। আমি তা বলি না। এ যুগের ঋষি হচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। খাদ্যবিজ্ঞানী যে ব্যবস্থা দেবেন, তাই মেনে নেওয়া ভাল। অবশ্য সেকালের ঋষিদের মতন আধুনিক ঋষিদেরও মতভেদ আছে। যাঁর ব্যবস্থা আমাদের মনের মতন হয়, তাই মেনে নেওয়া যেতে পারে।

ফণী। অঘোরবাবু, আপনাদের শাস্ত্রে আছে না—'মহাজনো

যেন গতঃ স পন্থাঃ ?' মহাজন অর্থাৎ বেশীর ভাগ লোকে যা করে, তাই হচ্ছে ধর্মের পথ। অতএব আমিষাহারই ধর্ম। আপনি ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন।

অঘোর। মহাজনের পথ ছেড়ে অন্য পথে চললেই লোকে ধর্মভ্রষ্ট হয় না। গৈরিকধারী সন্ন্যাসী, আজীবন ব্রহ্মচারী, ছাতু-মাত্র-ভোজী, নির্বাক মৌনী বাবা, বিবস্ত্র নেংটা বাবা—এরা খাপছাড়া, কিন্তু অধার্মিক নয়। নিরামিষভোজীকেও যদি এইসব ক্র্যাংকের দলে ফেলেন, তবে আপত্তি করব না। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না। কালক্রমে নিরামিষ ভোজনই সভ্যজনের প্রিয় হওয়া অসম্ভব নয়। অহিংসা প্রবৃত্তির প্রসারের ফলে আমাদের রুচি বদলাতে পারে। নিরামিষের তুলনায় আমিষ খাদ্যে টোমেইন আর নানা রকম ক্রিমি কীট (যেমন trichina, fluke ইত্যাদি) জন্মাবার সম্ভাবনা বেশী, এই কারণেও আমিষের আকর্ষণ কমতে পারে। হয়তো ভবিষ্যতে সভ্য মানবের বিচারে আমিষ খাদ্য অসুন্দর অহৃদ্য অনাবশ্যক গণ্য হবে। অনেক পাশ্চাত্ত্য শিকারী লিখেছেন, মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে বাঁদরের মাংস তাঁরা খেতে পারেন না। সর্বজীবে সমজ্ঞান বৃদ্ধি পেলে হয়তো কোনও মাংসেই রুচি হবে না।

মথুর। বাঁদর তো আমাদের পূর্বপুরুষ ?

অঘোর। ঠিক পূর্বপুরুষ নয়, নিকট জ্ঞাতি বলা যেতে পারে। সম্প্রতি প্রফেসর হালডেন দিল্লীতে বক্তৃতায়

বলেছেন, মাছই আমাদের অতিপ্রাচীন আদিম পূর্ব-পুরুষ।

মথুর। কি ভয়ানক কথা! তা হলে মাছ খাওয়া মানে পিতৃমাংস ভক্ষণ? আচ্ছা দেড় টাকা সেরের চুনো পুঁটিও কি আমাদের পূর্বপুরুষ?

অঘোর। চুনো পুঁটি কই মাগুর ইলিশ রুই কাতলা সবাই। তবে চিংড়ির কথা আলাদা, ওরা হল মাকড়সা আর কাঁকড়াবিছের সগোত্র।

মথুর। মহাভারত! তা হলে খাব কি?

অঘোর। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বলছে, হাতি ঘোড়া থেকে পোকা মাকড় পর্যন্ত সব প্রাণীই মানুষের ভক্ষ্য। প্রবৃত্তি বলছে, বাছা বাছা গুটিকতক প্রাণীই খেতে ইচ্ছা করে। অন্তরাত্মা বলছে, নিরামিষেই যখন কাজ চলে তখন জীব-হিংসার দরকার কি।

ফণী। সব গাঁজা। আমিষ ত্যাগ করলে মানুষের অধঃপতন হবে, নিরামিষ খাদ্যে এসেনশ্যাল আমিনো-অ্যাসিডের অভাব আছে।

অঘোর। খাদ্যবিজ্ঞানী আর রসায়নী হয়তো সে অভাব পূরণ করতে পারবেন। সয়া বীন, চীনা বাদাম, তিল, ঈস্ট, খুদে পানা ইত্যাদি নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট চলছে।

মথুর। তা হলে এখন করা যায় কি?

অঘোর। দেখ মথুর, প্রবৃত্তিই বলবতী। যাতে তোমার

রুচি হয়, যা তোমার পেটে সয়, তাই খাবে। ভবিষ্যতে হয়তো মাছ মাংসের অনুকল্প উপাদেয় সুষম নিরামিষ খাদ্য আবিষ্কৃত হবে, কিন্তু তা তোমার আমার ভোগে লাগবে না। মল্লিক মশায়ের বয়স কম, উনি হয়তো চেখে দেখবার সুযোগ পাবেন। এখন ওঠা যাক, অনেক বেলা হয়েছে।

১৮৭৯

গ্রহণীয় শব্দ

ভাবের বাহন ভাষা, ভাষার উপাদান শব্দ। শব্দের অর্থ যদি সর্বগ্রাহ্য হয় তবেই তা সার্থক, অর্থাৎ প্রয়োগের উপযুক্ত এবং সাহিত্যে গ্রহণীয়।

বাঙলা ভাষা ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। তার এক কারণ, বাঙালীর জীবনযাত্রার পরিবর্তন, অর্থাৎ নূতন বস্তু নূতন ভাব নূতন রুচি আর নূতন আচারের প্রচলন। অন্য কারণ, অজ্ঞাতসারে বা ইচ্ছাপূর্বক ইংরেজী ভাষার অনুকরণ। মৃত ভাষা ব্যাকরণের বন্ধনে মমির মতন অবিকৃত থাকতে পারে, কিন্তু সজীব চলন্ত ভাষায় বিকার বা পরিবর্তন ঘটবেই। আমাদের আহার পরিচ্ছদ আবাস সমাজব্যবস্থা আর শাসন-প্রণালী যেমন বদলাচ্ছে, তেমনি শব্দ শব্দার্থ আর শব্দবিন্যাসও বদলাচ্ছে।

যাঁরা গোঁড়া প্রাচীনপন্থী তাঁরা কোনও পরিবর্তন প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারেন না। আধুনিক ছেলেমেয়ের চালচলন যেমন অনেক লোকের পক্ষে দৃষ্টিকটু, আধুনিক বাঙলা ভাষার রীতিও সেই রকম। অন্ধ গোঁড়ামি সকল ক্ষেত্রেই অন্যায়, কিন্তু শুধু হুজুগ বা ফ্যাশনের বশে কোনও নূতন বস্তু বা রীতি মেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। ভাষার রীতির তুলনায় সামাজিক রীতির গুরুত্ব অবশ্য অনেক বেশী, তথাপি কোনও শিক্ষিত

লোকই চান না যে মাতৃভাষায় জঞ্জাল আসুক। সহসাগত কোনও শব্দ শব্দার্থ বা প্রয়োগরীতিকে সাহিত্যে স্থান দেবার আগে একটু যাচাই করে দেখা ভাল।

ভাষার সমৃদ্ধি হয় কৃতী লেখকের প্রভাবে, কিন্তু তার ক্রমিক মন্থর পরিবর্তনে জনসাধারণের হাতই বেশী। সাধারণ মানুষ ব্যাকরণ অভিধানের বশে চলে না। কয়েকজন শব্দের উচ্চারণে বা প্রয়োগে ভুল করে, তার পর অনেকে সেই ভুলের অনুসরণ করে, তার ফলে কালক্রমে নূতন শব্দ নূতন অর্থ আর নূতন ভাষার উৎপত্তি হয়। ভাষা মাত্রেই পূর্ববর্তী কোনও ভাষার বিকার বা অপভ্রংশ এবং একাধিক ভাষার মিশ্রণ। শব্দ অর্থ আর ভাষার এই স্বাভাবিক অভিব্যক্তি বা evolution বারণ করা যায় না। কিন্তু অভিব্যক্তিতেও মানুষের কিছু হাত আছে। মানুষ অন্ধভাবে সবরকম প্রাকৃতিক পরিবর্তন মেনে নেয় না, স্বচ্ছন্দাগত সব কিছুকে সাদরে বরণ করে না। অভিব্যক্তির বহু ক্ষেত্রে মানুষ সজ্ঞানে হস্তক্ষেপ করেছে, যে পরিবর্তন তার পক্ষে অনুকূল তাই ঘটাবার চেষ্টা করেছে। বন্য প্রাণী আর উদ্ভিদ থেকে গৃহপালিত পশুপক্ষী আর ভক্ষ্য শস্য ফলাদির উৎপত্তি মানুষেরই যত্নের ফল। ভাষার ক্ষেত্রেও আমাদের সতর্ক হস্তক্ষেপ শুভজনক হতে পারে।

বিষয়টি সহজ নয়। ভাষার সৌষ্ঠব রক্ষা আর প্রকাশ-শক্তি বর্ধনের প্রকৃষ্ট উপায় কি সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে, কোন্ শব্দ গ্রহণীয় বা বর্জনীয় তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে।

সবিস্তার আলোচনা না করে শুধু কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। তা থেকে হয়তো সতর্কতার প্রয়োজন বোঝা যাবে।

এমন অনেক বস্তু এদেশে আছে যার সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ শিক্ষিত জন এতকাল উদাসীন ছিলেন। সম্প্রতি এই প্রকার কয়েকটি বস্তুর গুরুত্ব বেড়েছে, সংবাদপত্র এবং সাধারণের পাঠ্যগ্রন্থে তাদের উল্লেখ না করলে চলে না। কিন্তু নামকরণে অসাবধানতা দেখা যাচ্ছে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ এদেশে আধুনিক পদ্ধতিতে লোহা তৈরি হচ্ছে, নূতন পরিকল্পনায় উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে যাবে। যে কাঁচা মাল বা খনিজ বস্তু থেকে লোহা তৈরি হয় তার বাঙলা নাম কি? রাশি রাশি এই বস্তু রেলগাড়িতে বোঝাই হয়ে লোহার কারখানায় যায়, কলকাতার বন্দর থেকে জাহাজে জাপান রাশিয়া ইত্যাদি দেশে রপ্তানি হয়। অতি প্রয়োজনীয় এই ভারতীয় সম্পদের একটা সর্বগ্রাহ্য নাম অবশ্যই চাই। ইংরেজী নাম iron ore, বৈজ্ঞানিক নাম hematite। যে অশিক্ষিত জন এই বস্তু পাহাড় কেটে বার করে বা খনি থেকে তোলে তারা বলে লোহা-পাথর। এই অতি সরল উত্তম নামটি কিন্তু বাঙলা কাগজে স্থান পায় না, লেখা হয়—লৌহপিণ্ড বা খনিজ লৌহ বা আকরিক লৌহ। তিনটে নামই ভুল। লৌহপিণ্ড মানে লোহার তাল, lump of iron। খনিজ বা আকরিক লৌহ বললে বোঝায়, যে লৌহ খনি বা আকরে থাকে। কিন্তু খনি বা আকরে কুত্রাপি লৌহ থাকে না, থাকে এক রকম পাথর যাতে লোহা যৌগিক অবস্থায়

আছে। মাটিতে আখ হয়, আখে চিনি আছে, আখকে ভূমিজ শর্করা বলা চলে না। খনি আর আকর শব্দের মানে একই, কিন্তু পারিভাষিক প্রয়োগে mineralএর বাঙলা খনিজ, oreএর বাঙলা আকরিক। অতএব iron oreএর শুদ্ধ প্রতিশব্দ লৌহ-আকরিক। কিন্তু লোহা-পাথর নাম আরও ভাল।

লোহার কথা আর একটু বলছি। লোহা-পাথর থেকে প্রথমে যে লোহা অশুদ্ধ অবস্থায় নিষ্কাশিত হয় তার মোটা মোটা বাটের নাম pig-iron। শূকর-দেহের সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করে এই নাম দেওয়া হয়েছে। এই বস্তু ভারতের বাইরে প্রচুর চালান যায়। Iron foundry বা লোহা ঢালাইখানায় এই লোহা গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে রেলিং, রাঁধবার কড়াই, বাটখারা ইত্যাদি নানা জিনিস তৈরি হয়। এই জাতীয় লোহার নাম cast-iron বা ঢালাই লোহা। সংস্কৃতে অনেক রকম নাম আছে, কিন্তু কোন্‌টিতে cast-iron বোঝায় তা স্থির করা যায় না। pig-ironএর বাঙলা নাম চাই। শূকর লৌহ চলবে না, বাজার চলিত নাম পিগ-লোহা বাঙলা ভাষায় মেনে নেওয়া ভাল।

Atom bomb অর্থে অনেকে আণবিক বোমা লেখেন। এই অনুবাদ ভুল। Atomicএর বাঙলা পারমাণবিক। পরমাণু বোমা লিখলে ঠিক হয়। এ সম্বন্ধে পরিমল গোস্বামী মহাশয় অনেকবার আলোচনা করেছেন।

যুদ্ধের সময় blackout অর্থে নিষ্প্রদীপ খুব শোনা যেত, এখনও বিজলীর অভাবে শহর অন্ধকার হলে বলা হয় নিষ্প্রদীপ।

কিন্তু blackoutএর উদ্দিষ্ট অর্থ আলোকহীনতা। নিষ্প্রদীপ মানে আলোকহীন। ভারতচন্দ্র বহুকাল আগে শুদ্ধ নাম রচনা করে গেছেন— অপ্রদীপ, অর্থাৎ আলোকের অভাব। শব্দটি বিশেষ্য বিশেষণ দুই রূপেই চলতে পারে। Blackoutএর প্রতিশব্দ রূপে অপ্রদীপই গ্রহণীয়।

সাত-আট বৎসর আগে civil supply অর্থে লেখা হত অসামরিক সরবরাহ। civil শব্দের বাঙলা ছিল না, তাই নঞর্থক অসামরিক শব্দের সৃষ্টি হয়েছিল। যেন সামরিক প্রয়োজনই মুখ্য, জনসাধারণের প্রয়োজন নিতান্তই গৌণ। এই রকম মনোভাবের ফলে এককালে non-Mahomedan নামটির সৃষ্টি হয়েছিল। আজকাল সরকারী নাম জনসংভরণ চলছে, কিন্তু প্রথম প্রথম খুব আপত্তি শোনা গিয়েছিল।

Subcontinentএর বাঙলা উপমহাদেশ। ইংরেজী কাগজে অবিভক্ত সমগ্র ভারত সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকলে লেখা হয়— in this Subcontinent। এর উদ্দেশ্য বোধ হয় পাকিস্থানকে কোনও রকমে ক্ষুণ্ণ না করা। বাঙলায় 'এই উপমহাদেশে' যেমন শ্রুতিকটু তেমনি অনর্থক। বিষ্ণুপুরাণে পরাশরের বচন আছে—

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যস্য সন্ততিঃ॥

এই বর্ণনা অনুসারে ভারতবর্ষ নামেই this Subcontinent, যেমন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া মানে নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক আর

আইসল্যাণ্ড। প্রাচীনকালে এই দেশে বহু স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল, ব্রিটিশ আমলেও ফ্রেঞ্চ পোর্তুগীজ অঞ্চল আর নেপাল ছিল, তথাপি সমগ্র দেশকে বলা হত India বা ভারতবর্ষ। পাকিস্থান হয়েছে বলেই ভারতবর্ষ নামের ভৌগোলিক অর্থ বদলাতে পারে না। আমাদের খণ্ডিত দেশকে শুধু ভারত বা ভারত রাষ্ট্র বলা যেতে পারে।

Chancellor ও Vice-chancellor অর্থে আচার্য ও উপাচার্য চলছে। এই দুই প্রতিশব্দ অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে করি। উপাচার্যের মানে assistant professor। Vice-chancellorকে এই নাম দিলে তাঁর মর্যাদার হানি হয়। এ সম্বন্ধে পূর্বে কিছু আলোচনা করেছি।

কথায় কথায় thanks, please, kindly ইত্যাদি বলা ইংরেজী শিষ্টাচার। আমরা তা মেনে নিয়েছি। একবার একটি মেয়ের অটোগ্রাফ খাতায় আমি নাম সহি করলে সে বলেছিল, ধন্যবাদ। আমি প্রশ্ন করলাম, কে ধন্য, তুমি না আমি? মেয়েটি প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল, তার পর উত্তর দিল— আমি, আমি। ধন্য শব্দের এক অর্থ কৃতার্থ, আর এক অর্থ খুব বাহাদুর, যেমন ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী। মেয়েটি প্রথম অর্থে নিজেকেই ধন্যবাদ দিয়েছিল, দ্বিতীয় অর্থে আমাকে দেয় নি। Thanksএর বাঙলা চাই, ঠিক সমার্থক না হলেও ধন্যবাদ মেনে নেওয়া যেতে পারে। Please, kindly স্থানে অনুগ্রহপূর্বক, দয়া করে ইত্যাদি বলা হয়। হিন্দীতে 'কৃপয়া' এই ছোট সংস্কৃত

পদটি চলছে, বাঙলাতেও মেনে নেওয়া যেতে পারে।

ইংরেজীতে অনেক লোকের নাম একত্র লিখতে হলে আগে Messrs বসানো হয়, অর্থাৎ এঁরা সকলেই Mister। হিন্দীতে তার নকল চলছে সর্বশ্রী, বাঙলাতেও মাঝে মাঝে দেখতে পাই। সর্বশ্রী শুনলেই মনে আসে হাওড়াশ্রী ব্যাঁটরাশ্রী। লোকে যদি এতই শ্রীর কাঙাল হয় তবে উৎকট সর্বশ্রী না লিখে শ্রীর পর কোলন বা ড্যাশ দিয়ে সমস্ত নাম লেখা যেতে পারে।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রতি আমাদের কিছু পক্ষপাত দেখা যায়। জীবনচরিত বা চরিত স্থানে জীবনী, জন্মবার্ষিক বা জন্মদিন স্থানে জন্মবার্ষিকী, পরিক্রম বা পরিক্রমণ স্থানে পরিক্রমা, শতাব্দ স্থানে শতাব্দী, প্রকাশ স্থানে প্রকাশনা ইত্যাদি চলছে। এতে আপত্তির কারণ নেই, কিন্তু স্থানে অস্থানে কার্যকরী শব্দটির এত চলন হল কেন? শুধু খবরের কাগজে নয়, অনেক জনপ্রিয় লেখক আর অধ্যাপকের লেখাতেও দেখতে পাই— কার্যকরী উপায়, কার্যকরী সমাধান, প্রস্তাব কার্যকরী করা ইত্যাদি। কার্যকর বা কার্যকারী লিখতে বাধে কেন?

আর একটি অদ্ভুত ফ্যাশন সম্প্রতি দেখা দিয়েছে—ক্লীবলিঙ্গ প্রীতি। পত্রিকা বা পুস্তকের নাম রূপম্, সুন্দরম্, অবনীন্দ্রচরিতম্ ইত্যাদি রাখলে আপত্তি করা যায় না। বোধ হয় গৌরব বৃদ্ধির জন্যই সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত নাম দেওয়া হয়। ভরতনাট্যম্ও এই রকম হতে পারে। অনেক দ্রাবিড়ী নামের শেষে ম্ আছে, যেমন— পায়সম্ রসম্ পপডম্ শ্রীরঙ্গম্ চিদম্বরম্। ভরতনাট্যম্ও

হয়তো সেই রকম। সেদিন রাস্তায় একটি কবিরাজী দোকানে সাইন বোর্ড দেখেছি— শ্রীআয়ুর্বেদম্। সংস্কৃত ভাল করে না শিখলে কবিরাজ হওয়া যায় না। আয়ুর্বেদ পুংলিঙ্গ শব্দ। দোকানের মালিক শেষে ম্ যোগ করে আয়ুর্বেদকে নপুংসক করলেন কেন? আর একটি শোচনীয় নাম মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। একজন লেখক তাঁর রচনার শেষে নাম লেখেন— ভারতপুত্রম্। এই ভারতসন্তান ক্লীবত্ব বরণ করলেন কোন্ দুঃখে?

১৮৮০

শিক্ষার আদর্শ

আমার শোবার ঘরের পাশে একটা বকুল গাছ আছে, এক জোড়া বুলবুলি আর গোটাকতক শালিক চড়াই তাতে রাত্রিযাপন করে। চৈত্র মাসে নূতন পাতা গজাবার পর তারা প্রায় সকলেই বিতাড়িত হয়, দুটো কাগ এসে গাছে বাসা বাঁধে। নিশ্চয় একটা পুরুষ আর একটা স্ত্রী। কিছুদিন পরে দেখি, বাসার খড়কুটোর মধ্যে একটা কদাকার বাচ্চা প্রকাণ্ড হাঁ করছে, তার মা নিজের ঠোঁট দিয়ে সন্তানের লাল মুখের ভিতর খাবার পুরে দিচ্ছে। শিশু কাগ ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে, তার মুখের ব্যাদান আর রক্তিমা কমে আসে, সে নিজের ঠোঁট দিয়ে মায়ের মুখ থেকে খাবার তুলে নেয়। আরও কিছুদিন পরে দেখি, কিশোর কাগ বাসা ছেড়ে ডালের উপর বসেছে, তার মা তাকে ঠেলা দিচ্ছে, বাচ্চা ভয়ে কা কা করছে, পাখা নাড়ছে, আর দু পায়ের আঙুল দিয়ে ডাল আঁকড়ে আছে। তার পর তরুণ কাগ হঠাৎ শাখাচ্যুত হয়ে ঝটপট করছে, তার মা নিজের দেহ দিয়ে তাকে সামলাচ্ছে। একজন সাঁতারপটু লোক ছোট ছেলেকে যেমন করে সাঁতার শেখায়, কাগের মা তেমনি করে নিজের বাচ্চাকে উড়তে শেখাচ্ছে।

পাখির যা প্রাথমিক শিক্ষা, ওড়া আর আহার সংগ্রহ, তা সে নিজের মায়ের কাছ থেকেই পায়। বাকী যা কিছু সবই

তার সহজ প্রবৃত্তি (iustiuct) আর অভিজ্ঞতার ফল। মাছ ব্যাঙ সাপ ইত্যাদি নিম্নতর প্রাণী পিতামাতার উপর আরও কম নির্ভর করে, তাদের জীবিকার্জনের সামর্থ্য জন্মগত।

আদিম মানুষ পিতা মাতা আর গোষ্ঠীবর্গের কাছ থেকে জীবনযাপনের উপযোগা সকলপ্রকার শিক্ষা পায়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজন বেড়েছে, শিক্ষার ব্যবস্থা ক্রমশ জটিল হয়েছে। আত্মীয়স্বজনের কাছে যা শেখা যায় তা এখন পর্যাপ্ত নয়, সমাজ আর রাষ্ট্রই নানাপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ইতর প্রাণী আর আদিম মানুষ পিতামাতা ইত্যাদির কাছে যা শেখে তা যতই সামান্য হক, তাদের জীবন-যাত্রার পক্ষে পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট। আধুনিক সভ্য মানুষের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাও কি পর্যাপ্ত? অন্য দেশ সম্বন্ধে আলোচনা না করে আমাদের দেশের কথাই বলছি।

প্রচলিত শিক্ষাকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। (১) সামান্য শিক্ষা, যা সকলের পক্ষেই আবশ্যক এবং পরবর্তী শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ গণ্য হয়। (২) বিশেষ শিক্ষা, যা শিক্ষার্থীর রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে নির্ধারিত হয়। (৩) বৃত্তিমুখী শিক্ষা, যার উদ্দেশ্য জীবিকার্জনের উপযোগা কোনও কর্মে জ্ঞান ও পটুতা লাভ।

(১) সামান্য শিক্ষা।— আমাদের দেশে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য যেসব বিষয় নির্দিষ্ট আছে সেগুলিকেই সামান্য

শিক্ষার অঙ্গ বলা যেতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত বুনিয়াদী তালিমও সামান্য শিক্ষা, যদিও তার অঙ্গগুলি কিছু অন্যরকম। নিরক্ষর লোকেও জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, কেউ কেউ কোটিপতি ধনী বা সাধু মহাত্মাও হতে পারে, তথাপি বিদ্যার প্রয়োজন চিরকালই স্বীকৃত হয়েছে। এককালে লেখাপড়া বললে বোঝাত ন্যূনতম বিদ্যা অর্থাৎ নামমাত্র লেখা আর পড়া, আর একটু অঙ্ক করা। ইংরেজীতে এরই নাম three Rs., reading, writing and rithmetic। এই লেখাপড়া কখনই যথেষ্ট গণ্য হয় নি. শাস্ত্র (অর্থাৎ সুশৃঙ্খল কেতাবী বিদ্যা) না পড়লে মানুষ অন্ধবৎ হয়, একথা বিষ্ণুশর্মা হিতোপদেশ গ্রন্থে বলেছেন—

অনেকসংশয়চ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকং।
সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

অনেক সংশয়ের উচ্ছেদক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রদর্শক সকলের লোচনস্বরূপ শাস্ত্রজ্ঞান যার নেই সে অন্ধই।

এদেশে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত যেসব বিষয় পড়ানো হয় তার বার বার পরিবর্তন হয়েছে, তথাপি এইগুলিকে প্রধান অঙ্গ বলা যেতে পারে।— মাতৃভাষা, ইংরেজী, সংস্কৃত, ভারতের ইতিহাস ও শাসনতন্ত্র, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান ইত্যাদি। এইসব বিদ্যার অল্পমাত্র জ্ঞানও যার নেই সে 'অন্ধ এব', অর্থাৎ তাকে অশিক্ষিত বলা যেতে পারে।

(২) বিশেষ শিক্ষা।— উল্লিখিত সামান্য শিক্ষায় সকলে

তৃপ্ত হয় না, অনেকে কয়েকটি বিদ্যা ভাল করে আয়ত্ত করতে চায়। এই বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন নাও হতে পারে। অনেকে কেবল শখ বা জ্ঞানলাভের জন্যই বিদ্যা-বিশেষের চর্চা করেন। হাইকোর্টের জজ ব্যারিস্টার ইত্যাদির মধ্যে গণিত বিজ্ঞান আর সংস্কৃতে উচ্চ উপাধিধারী লোক বিরল নন। এরা যে বিশেষ বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন তা বিচার সংক্রান্ত কাজের পক্ষে অনাবশ্যক।

এক শ্রেণীর বিদ্যাকে ইংরেজীতে বলা হয় humanities। এই সংজ্ঞাটির অর্থ সুনির্দিষ্ট নয়। মোটামুটি বলা যেতে পারে, লাটিন গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্য এর একটি প্রধান অঙ্গ। কয়েকটি আধুনিক বিদ্যাও এর অন্তর্গত, কিন্তু পরীক্ষা- ও প্রযুক্তি-মূলক বিজ্ঞান (experimental and applied science) নয়। কলেজের পাঠ্য বিষয়কে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, আর্টস্ ও সায়েন্স। সায়েন্সের প্রতিশব্দ আছে— বিজ্ঞান। খবরের কাগজে আর্টস্ স্থানে কলা দেখিতে পাই, কিন্তু এই অনুবাদ অন্ধ নকল। আর্টস্ বললে যেসব কলেজী বিদ্যা বোঝায় তাদের কলা নাম দিলে উপহাস করা হয়। আর্টস্ আর হিউম্যানিটিজকে যুক্তভাবে সাহিত্যাদিবর্গ বলা যেতে পারে। প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য এবং ইতিহাস জীবনচরিত দর্শন সমাজ সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় সাহিত্যাদির অন্তর্গত।

ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে কলেজের উচ্চতর শ্রেণীতে বিজ্ঞানের

চাইতে সাহিত্যাদিবর্গের ছাত্র বেশী দেখা যেত। তখন বিজ্ঞ লোকেরা বলতেন, সায়েন্স তো ছেলেখেলা, আসল বিদ্যা হচ্ছে ইংরেজী সাহিত্য, তার পরে ফিলসফি। এখন রুচির পরিবর্তন হয়েছে, বিজ্ঞানের ছাত্রই আজকাল বেশী। এই পরিবর্তনের কারণ, সাহিত্যাদি শিখলে জীবিকার্জনের যত সম্ভাবনা, বিজ্ঞান শিখলে তার চাইতে বেশী। ভারত সরকার শিল্পবর্ধনের ব্যাপক পরিকল্পনা করেছেন, তার ফলে বিজ্ঞানীর চাকরি পাবার সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। অর্থবিদ্যা (economics), বাণিজ্য (commerce) প্রভৃতি বিশেষ বিদ্যাও আজকাল জনপ্রিয় হয়েছে, শিখলে জীবিকার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

(৩) বৃত্তিমুখী শিক্ষা।— এই শ্রেণীর শিক্ষা হাতেকলমে না শিখলে সম্পূর্ণ হয় না। আইন আর এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা বৃত্তিমুখী, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়। ডাক্তারি শিক্ষার পদ্ধতিকেই প্রকৃতপক্ষে বৃত্তিমুখী বলা চলে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র রোগীর সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসেন, চিকিৎসা কার্যেও সাহায্য করেন, সেজন্য তাঁর বৃত্তির উপযোগী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদের শিক্ষার্থীও ভবিষ্যৎ মক্কেল শ্রেণীর সম্পর্কে আসেন, সেজন্য তাঁর শিক্ষাও যথার্থ বৃত্তিমুখী। আইন শিক্ষার্থীকে যদি বাদী-প্রতিবাদীর সম্পর্কে আনা হত এবং মকদ্দমা চালাবার কিছু ভার দেওয়া হত, এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীকে দিয়ে যদি নূতন ব্রিজ বাঁধ বা কারখানার প্ল্যান এস্টিমেট আর তদারকের কাজ কিছু কিছু করানো হত, তবেই

তাঁদের শিক্ষা যথার্থ বৃত্তিমুখী হত।

মানুষের শৈশবে যার আরম্ভ হয় এবং জীবিকানির্বাহের উপযোগী কর্মে নিয়োগ পর্যন্ত যা চলে, যাতে যথাসম্ভব শরীর আর মনের উৎকর্ষ এবং অর্থোপার্জনের যোগ্যতা লাভ হয়, সেই সমগ্র শিক্ষাই পর্যাপ্ত শিক্ষা। এরূপ শিক্ষার উদ্দেশ্য— সকল লোকেরই সামর্থ্য অনুযায়ী বিদ্যা আর জীবিকার বিধান। শুনতে পাই সোভিএট রাষ্ট্রে সমস্ত প্রজার জন্য এই ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেখানে কর্ম নির্বাচনে প্রজার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কতটা গ্রাহ্য হয় জানি না। ভারতে এবং অন্যান্য সকল দেশে অল্প-সংখ্যক প্রজাই সরকারী কাজ পায়, বাকী সকলকেই নিজের চেষ্টায় জীবিকার যোগাড় করতে হয়। আমাদের দেশে সকলে কাজ পায় না, সেজন্য বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ ভয়াবহ হয়ে উঠছে।

বন্দে মাতরম্ স্তোত্রে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশকে ধরণীং ভরণীং বলেছেন, অর্থাৎ বঙ্গমাতা তাঁর সন্তানগণকে ধারণ করেন, ভরণও করেন। এখন নানা কারণে আমাদের মাতৃভূমির ধারণ ও ভরণের ক্ষমতা খর্ব হয়েছে। সকল প্রজার উপযুক্ত পর্যাপ্ত শিক্ষা আর জীবিকার সংস্থান শীঘ্র সম্ভাব্য না হলেও কল্যাণ রাষ্ট্র বা ওয়েলফেয়ার স্টেটের লক্ষ্য তাই হওয়া উচিত।

শিক্ষা যদি পর্যাপ্ত বা বৃত্তিমুখী নাও হয় তথাপি জীবিকার্জনের উপযোগী হতে পারে। যাঁরা কেবল সাহিত্যাদি

বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন তাঁরাও রাষ্ট্রের অতি উচ্চ পদ পেতে পারেন, সরকারী বিভাগের অধিকর্তা, রাজনীতিক, অধ্যাপক, লেখক, সম্পাদক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি হতে পারেন। যাঁরা বিজ্ঞানাদি বিশেষ বিদ্যা আয়ত্ত করেন অথবা বৃত্তিমুখী শিক্ষা লাভ করেন তাঁদের জীবিকার ক্ষেত্র অবশ্য আরও বিস্তৃত।

আমাদের শিক্ষালাভের তিনটি পর্যায় আছে— (১) পাঠশালা ও স্কুল, (২) কলেজ, (৩) বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া, প্রায়োগিক (technical) ও বৃত্তিমুখী শিক্ষার জন্য কতকগুলি পৃথক শিক্ষালয় আছে, যেমন মেডিক্যাল, এঞ্জিনিয়ারিং ও ল কলেজ, চারু ও কারু শিল্প বা arts and crafts-এর শিক্ষালয়, সংগীত শিক্ষালয় ইত্যাদি। এই প্রকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত।

ইংরেজী ইউনিভার্সিটি শব্দের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয় শব্দ রচিত হয়েছে। এই বৃহৎ শব্দটির বদলে একটি ছোট নাম চালাতে পারলে সকলেরই সুবিধা হয়। বিদ্যামণ্ডল, বিদ্যাচক্র, বিদ্যাকুল, এইরকম কিছু চালানো যায় না কি?

নামের আদিতে বিশ্ব থাকলেও তার মানে এ নয় যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাবতীয় বিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষণীয় বিষয় আর শিক্ষার্থীর বাহুল্য হলে সকল ক্ষেত্রে ফল ভাল হয় না। প্রাচীনকালের কুলপতি বিপ্রর্ষিরা তাঁদের আশ্রমে নাকি দশ সহস্র মুনিকে পালন করতেন আর শিক্ষা দিতেন। নালন্দা প্রভৃতি বিহারেও অসংখ্য বিদ্যার্থী থাকত। তিন-চার শ বৎসর

আগেও বিদ্যার সংখ্যা কম ছিল, মেধাবী লোকে চেষ্টা করলে সর্ববিদ্যাবিশারদ হতে পারত। কিন্তু এখন বিদ্যার (বিশেষত বিজ্ঞানের) শাখা প্রশাখা অত্যন্ত বেড়ে গেছে, আজকাল সর্বজ্ঞ বা বহুজ্ঞের চাইতে বিশেষজ্ঞের আদর বেশী। ইংরেজীতে একটি পরিহাস আছে— বিশেষজ্ঞ তাঁকেই বলে যিনি অল্প বিষয় সম্বন্ধে বিস্তর জানেন। অতএব গণিতের পদ্ধতি অনুসারে বলা চলে— শূন্য বিষয় সম্বন্ধে যাঁর অনন্ত জ্ঞান আছে তিনিই চরম বিশেষজ্ঞ।

সেকালের অসংখ্য বিদ্যার্থী সমন্বিত ঋষিকুল বা বিহারের অনুরূপ ব্যবস্থা এখন অচল। যেখানে কয়েকটি বিদ্যার প্রকৃষ্ট চর্চার ব্যবস্থা আছে সেই বিদ্যামণ্ডলই প্রশস্ত। অতিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা প্রধান তাঁরা যদি প্রশাসন বা পরিচালন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তবে অধ্যাপনা উপেক্ষিত হবে।

পাশ্চাত্ত্য দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিদ্যাচর্চার খ্যাতি আছে। প্রাচীন ভারতে তক্ষশিলা আয়ুর্বেদ চর্চার জন্য, উজ্জয়িনী জ্যোতিষের জন্য, মিথিলা জনক রাজার কালে অধ্যাত্ম বিদ্যার জন্য এবং পরবর্তীকালে ন্যায়শাস্ত্র চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান কালে আমাদের দেশেও বিভিন্ন বিদ্যামণ্ডলের বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয়। সকল বিশ্ববিদ্যালয় একই ছাঁচে গড়ে উঠলে ফল ভাল হবে না।

বিশ্বভারতী এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। শুনতে পাই সেখানকার শিক্ষার ব্যবস্থা কি রকম হওয়া উচিত তা নিয়ে

প্রবল মতভেদ আছে। এক দল নাকি বলেন, সেকেলে আশ্রমিক ব্যবস্থা চলবে না, এখন আধুনিক পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি মেনে নিতে হবে। আর এক দল বলেন, গুরুদেবের যে আদর্শ ছিল, তিনি যে রীতি চালিয়ে গেছেন তা থেকে কিছুমাত্র স্খলন হলে বিশ্বভারতী পণ্ড হবে।

প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ আর তাঁর প্রবর্তিত রীতির অনুসরণ করলে বিশ্বভারতীর অগ্রগতি ব্যাহত হবে—এই ধারণার কারণ দেখি না। কলিকাতা প্রভৃতি অতিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যা শেখানো হয়, উচ্চ বিজ্ঞানাদি শেখাবার যে রকম ব্যবস্থা আছে, বিশ্বভারতীতে ঠিক সে রকম না হলে ক্ষতি কি? কবি-গুরুর জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে আর বিশ্বভারতীতে যা শিক্ষণীয় ছিল তা প্রধানত সাহিত্যাদি বিদ্যা— হিউম্যানিটিজ ও আর্টস্, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাসাদি, তা ছাড়া চিত্র সংগীত ইত্যাদি চারুকলা আর কয়েকটি কারুকলা। শিক্ষার সেই বৈশিষ্ট্য আর পরিধি বজায় রেখেই বিশ্বভারতীর অগ্রগতি ও বিবৃদ্ধি হতে পারে। পূর্বে যে সামান্য শিক্ষার কথা বলেছি (যা সকলের পক্ষেই অপরিহার্য) তারই অঙ্গ হিসাবে বিজ্ঞান শিক্ষার সীমা যদি আই এস-সি শ্রেণী পর্যন্তই রাখা হয় এবং বহুবিধ বিজ্ঞান চর্চার আয়োজন যদি নাও হয় তাতেই বা ক্ষতি কি? যেসব ছাত্র উচ্চতর বিজ্ঞান অথবা চিকিৎসা বাস্তুবিদ্যা যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি প্রায়োগিক বা বৃত্তিমুখী বিদ্যা শিখতে চায় তারা কলকাতায় বা অন্যত্র শিক্ষালাভ করতে

পারে। Liberal education বা উদার শিক্ষা বা polite learning বা ভব্য শিক্ষা বললে যা বোঝায় তাই বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্য হতে পারে। কবিগুরুর যা একান্ত কাম্য ছিল— বিভিন্ন দেশের মনীষীদের চিন্তার আদান-প্রদান, বিশ্বভারতী যদি সেই মিলনের ক্ষেত্র হয় তা হলেও তার প্রতিষ্ঠা সার্থক হবে।

গাছতলায় বা ফাঁকা জায়গায় বিনা চেয়ার টেবিলে পঠন-পাঠনের পদ্ধতি যথাসম্ভব বজায় রাখলে বিশ্বভারতীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না। প্রাসাদের বদলে আটচালাতেও উচ্চ শিক্ষা চলতে পারে। বাহ্য আড়ম্বরের চাইতে বিদ্বান কুশলী ও সন্তুষ্ট অধ্যাপকবর্গের প্রয়োজন অনেক বেশী। পণ্ডিত নেহরু সম্প্রতি এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সকল বিদ্যাস্থান সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

১৮৮০

বাংলা সাইক্লোপিডিয়া

অষ্টাদশ শতাব্দের মাঝামাঝি কয়েকজন ফরাসী পণ্ডিত (Diderot, D' Alembert, Voltaire, Euler ইত্যাদি) Encyclopedie নাম দিয়ে একটি গ্রন্থমালা রচনা করেন। নামটি গ্রীক থেকে উদ্ভূত, মৌলিক অর্থ— বিদ্যাপরিবৃতি, অর্থাৎ সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডার। প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী মত প্রকাশের জন্য সম্পাদকগণ তখনকার রোমান ক্যাথলিক ধর্মনেতাদের বিষ-দৃষ্টিতে পড়েছিলেন, রাজদণ্ডও ভোগ করেছিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের কিছু পরে ইংরেজী Encyclopedia Britannica সংকলিত হয় এবং এ পর্যন্ত তার অনেক সংস্করণ হয়েছে। এই প্রকাণ্ড বহুখণ্ড বহুবার সংশোধিত গ্রন্থে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের লেখা যে সকল বিবৃতি আছে তা প্রামাণিক বলে গণ্য হয়।

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্তৃক সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' এবং অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক আরব্ধ 'মহাকোষ' গ্রন্থের উদ্দেশ্য উক্ত দুই গ্রন্থের অনুরূপ। নানা বিদ্যার ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবৃতিসংবলিত কোষগ্রন্থের সম্পাদন একজনের সাধ্য নয়, বহু বিশেষজ্ঞের সাহায্য ভিন্ন প্রামাণিক সংকলন অসম্ভব। নগেন্দ্রনাথ যা সমাপ্ত করেছেন এবং অমূল্যচরণ যার কয়েক খণ্ড প্রকাশ করে গেছেন তা অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফল। এন-সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা যেমন মুখ্যত ব্রিটিশ জাতি, আর

ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনে রচিত, নগেন্দ্রনাথ আর অমূল্যচরণের গ্রন্থ তেমনি বাঙালী আর বাংলা ভাষার প্রয়োজনে রচিত।

কয়েকটি বৃহৎ বাংলা শব্দকোষে ভূগোল, ইতিহাস ও সাহিত্যবিষয়ক তথ্য এবং জীবনচরিত আছে। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বহু বৎসর পূর্বে যে 'বাঙ্গালাশব্দ-কোষ' রচনা করেছিলেন তাতে এদেশের খনিজ, বনজ, কৃষিজ দ্রব্য, প্রাণী, নৌকাদি যান, শিল্পসাধিত্র যথা তাঁত ঢেঁকি ঘানি, মাছ-ধরা জাল, গৃহোপকরণ এবং তাস পাশা দাবা প্রভৃতি খেলার বিবরণও আছে। অন্য কোনও বাংলা শব্দকোষে এসব পাওয়া যায় না। যোগেশচন্দ্রের গ্রন্থ সংস্কৃতেতর বাংলা শব্দের অভিধান, সেজন্য তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ প্রায় বর্জিত হয়েছে, তথাপি কয়েকটি সংস্কৃত নামযুক্ত বিষয়ের বিবৃতি আছে, যেমন সংগীতের তাল ও রাগ-রাগিণী। তাঁর শব্দকোষ এখন পাওয়া যায় না। নব সংস্করণের জন্য তিনি গ্রন্থের আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন, শুনেছি তৎসম শব্দ যোগ করে অভিধানও পূর্ণাঙ্গ করেছেন। সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসাহায্যে এই বহু তথ্যপূর্ণ অদ্বিতীয় গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের আয়োজন হচ্ছে।

বহুমূল্য কোষগ্রন্থ কেনা সকলের সাধ্য নয়, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন প্রকাণ্ড গ্রন্থ নাড়াচাড়া-করাও অসুবিধাজনক। ইংরেজীতে বড় মাঝারি ছোট অনেক রকম সাইক্লোপিডিয়া আছে। ছোট-গুলির দাম বেশী নয়। তাতে যে বিবৃতি থাকে তা খুব সংক্ষিপ্ত

হলেও মোটামুটি কাজ চলে। বাংলায় এই রকম ছোট কোষ রচনার চেষ্টা কয়েকজন করেছেন, কিন্তু ইংরাজী গ্রন্থের সঙ্গে কোনওটির তুলনা হয় না।

একটি ছোট সুসংকলিত প্রামাণিক বাংলা সাইক্লোপিডিয়ার প্রয়োজন আছে। হাজার বার শ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ যদি পনের-কুড়ি টাকার মধ্যে পাওয়া যায় তবে বোধ হয় ক্রেতার অভাব হবে না। ইংরেজীর নকলে এই ছোট গ্রন্থের নাম 'বিশ্বকোষ' বা ওই রকম কিছু দিলে অতিরঞ্জন হবে। 'বিষয়-কোষ' নাম চলতে পারে শব্দকোষ বা অভিধানের প্রধান উদ্দেশ্য —শব্দের রূপ অর্থ ও প্রয়োগবিধির নির্দেশ। বিষয়কোষের উদ্দেশ্য— বিষয় (subject) অর্থাৎ পদার্থ, জাতি (class), ব্যক্তি (individual), স্থান, ঘটনা প্রভৃতির বিবৃতি। শব্দকোষ যেমন ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চার সহায়, বিষয়কোষ সেইরূপ বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন ও জ্ঞান লাভের সহায়।

যে কোষগ্রন্থের প্রস্তাব করছি তাঁর উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার গৌরব বর্ধন নয়, শুধুই উপস্থিত প্রয়োজন সাধন। সাধ্যের অতিরিক্ত সঙ্কল্প করলে কাজ অগ্রসর হবে না, হয়তো পণ্ড হবে। এমন একটি গ্রন্থ চাই যা থেকে ছাত্র শিক্ষক লেখক পাঠক সাংবাদিক রাজনীতিক ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলেই দেশীয় বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার সংক্ষিপ্ত উত্তর পান। যা ইংরেজী গ্রন্থে পাওয়া যায় তা দেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখি না, তাতে

সম্পাদনের শ্রম আর প্রকাশের খরচ অনর্থক বাড়ানো হবে। আমরা এখনও ইংরেজী ভাষার চর্চা করি। যখন ইংরেজী বর্জন করব, তখন বিষয়কোষের পরিধি বাড়ালেই চলবে, যাতে বিদেশী গ্রন্থের দরকার না হয়। আপাতত পাশ্চাত্ত্য কোনও বিষয় জানতে হলে ইংরেজী সাইক্লোপিডিয়াই দেখব। যা তাতে নেই, যা নিতান্ত এদেশের শুধু তার জন্যই বাংলা বিষয়-কোষের প্রয়োজন।

শব্দকোষের মতন বিষয়কোষ বর্ণানুক্রমেই সংকলিত হওয়া আবশ্যক। বিষয়ের শ্রেণী অনুসারে ভাগ করলে (অর্থাৎ বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প জীবন-চরিত ইত্যাদি পৃথক পৃথক দিলে) সুবিধা হবে না। প্রস্তাবিত গ্রন্থে আল্পস্, লণ্ডন, পিরামিড, তড়িৎতত্ত্ব, সাইক্লোট্রন, ব্যাকটিরিয়া, বাওবাব-বৃক্ষ অনাবশ্যক, কিন্তু অবিভক্ত ভারতের নগর পর্বত নদী মন্দিরাদি, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ, শাল, সেগুন, ধান, যব, গম, আম, কাঁটাল, কলা থাকবে। এদেশের চটকল, কাপড় কল, কাগজ, সিমেণ্ট, রাসায়নিক সার, লোহা, তামা, এঞ্জিন, টেলিফোন, বন্দুক কামান বারুদ প্রভৃতির কারখানা, দামোদর পরিকল্পনা ইত্যাদির কথাও থাকবে। সীজার, শেক্সপীয়র, মার্কস, স্তালিন, চার্চিল, ফরাসী-বিপ্লব, ইউরোপীয় দর্শন সাহিত্য ও কলা বাদ যাবে; চন্দ্রগুপ্ত, কালিদাস, তুলসীদাস, রবীন্দ্রনাথ, বরাহমিহির, গান্ধী, সিপাহী-বিদ্রোহ, ভারতীয় দর্শন সাহিত্যকলা দিতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় এলিজাবেথ বাদ যাবেন, আলেকজাণ্ডার,

হিউএন্ত্সাং, মহম্মদ ঘোরি, অলবেরুনি, ভিক্টোরিয়া থাকবেন, কারণ তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘটেছিল। কৃষ্ণ বুদ্ধ চৈতন্য রামমোহন রামকৃষ্ণ থাকবেন, বিদেশী হলেও জরথুস্ত্র খ্রীষ্ট মহম্মদ সেণ্ট টমাস থাকবেন, কারণ এঁদের সঙ্গে বহু ভারতবাসীর ধর্মীয় সম্বন্ধ আছে; কিন্তু আখেনাটেন সেণ্ট পল মার্টিন লুথার বাদ যাবেন। কংগ্রেস মোসলেম লীগ হিন্দু মহাসভা কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি ভারতীয় রাজনীতিক দল থাকবে, কিন্তু নাৎসী বলশেভিক কুমেনটাং প্রভৃতি বাদ যাবে।

কিউবা কোথায়? প্লেটোর প্রধান রচনাবলী কি কি? ক্যাসানোভা কে? আইফেল টাওয়ার কি? ইভোলিউশন থিওরি কি? জেসুইট কোয়েকার মরমন কারা? এই সব প্রশ্নের জন্য আমরা ইংরেজী সাইক্লোপিডিয়া দেখব। বাংলা বিষয়কোষে দেখব— মাণ্ডি রাজ্য কোথায়? ভাস কবির প্রধান রচনা কি কি? পরাগল খাঁ কে? যন্ত্রমন্ত্র কি? নব্য ন্যায় কি রকম? মিতাক্ষরা আর দায়ভাগের প্রভেদ কি? নাথপন্থী কর্তাভজা ওআহাবী কারা?

এই রকম একটি বিষয়কোষ রচনা করতে হলে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের সমবেত চেষ্টা চাই। তাঁরা এক বা একাধিক সম্পাদকের নির্দেশ অনুসারে লিখবেন অথবা তথ্য যোগান দেবেন। বাংলা দেশে যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের তুল্য অশেষজ্ঞ পণ্ডিত দ্বিতীয় নেই। বয়স ছিয়ানব্বই হলেও তাঁর নানা বিষয়ে আগ্রহ আছে, এখনও তিনি লেখেন। প্রস্তা-

বিত গ্রন্থের সম্পাদনের ভার তাঁকে দিতে বলছি না, লেখার জন্য কিছুমাত্র পীড়ন করতেও বলছি না। বিষয়কোষ যাঁরা রচনা করবেন তাঁদের কর্তব্য হবে যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে যোগ রাখা, তাঁর উপদেশ নেওয়া, এবং তাঁর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। নানা বিদ্যায় তাঁর অধিকার আছে, ভারতীয় জ্যোতিষ উদ্ভিদ প্রাণী এবং চিরাগত শিল্প সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান, এবং অনেক তথ্য তাঁর জানা আছে যা আমাদের আধুনিক শিক্ষিত বিজ্ঞানীরা জানেন না। এদেশের লোকাচার এবং ব্রত-পূজাদি সম্বন্ধেও তিনি অনেক জানেন। তিনি বর্তমান থাকতে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে যদি তথ্য আহরণ না করি, তবে আমরা বঞ্চিত হব।*

এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের উদ্যোগ কে করবেন? বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ জড়ত্ব লাভ করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিত্য কর্ম আর শিক্ষার সংস্কার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, নূতন কিছুতে হাত দেবেন মনে হয় না। উত্তর ও মধ্য প্রদেশের সরকার নিজ ভাষার উন্নতির জন্য প্রচুর টাকা খরচ করেছেন, শুনছি একটি ছোট হিন্দী সাইক্লোপিডিয়া রচনারও আয়োজন হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র-পুরস্কার ছাড়া বাংলা ভাষার জন্য কিছু খরচ করেন কি না জানি না। নানা পরিকল্পনা আর বিদেশী বিশেষজ্ঞদের জন্য তাঁরা অজস্র টাকা যোগাতে পারেন।

* এই প্রবন্ধ লেখবার সময়ে যোগেশচন্দ্র জীবিত ছিলেন।

যাতে এদেশের শিক্ষার সাহায্য হয়, জিজ্ঞাসুর জ্ঞানলাভ হয়, এমন একটি উদ্দেশ্যের জন্য তাঁরা কি কয়েক হাজার টাকা খরচ করতে পারেন না ? রাধাকান্ত দেব, মহাতাব চাঁদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের তুল্য কোনও বিদ্যোৎসাহী বদান্য ব্যক্তি বা ধনী বাঙালী ব্যবসায়ী যদি সাহস করে গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন করেন, তবে তাঁদের ক্ষতি না হয়ে লাভেরই সম্ভাবনা।

গ্রন্থ রচনার জন্য এমন একদল লোকের প্রয়োজন হবে যাঁরা ভূগোল ইতিহাস পুরাণ দর্শন বিবিধ বিজ্ঞান, কৃষি গোপালন খনিকর্ম শিল্প চিকিৎসা স্বাস্থ্যতত্ত্ব আইন রাজনীতি অর্থনীতি পরিসংখ্যান প্রত্নতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব লোকাচার সাহিত্য চারুকলা স্থাপত্য, বিবিধ ধর্মসম্প্রদায়, খ্যাত লোকের জীবনচরিত, ইত্যাদিতে অভিজ্ঞ। যাঁরা শুধু পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাই শিখেছেন তাঁরা বেশি কিছু করতে পারবেন না। এদেশের ঐতিহ্য প্রকৃতি আর আধুনিক শিল্পোদ্‌যোগ সম্বন্ধে যাঁরা খবর রাখেন তাঁরাই এই কাজের যোগ্য। খ্যাতিমান সাক্ষিগোপাল বা অতি বৃদ্ধ অক্ষম লোককে সম্পাদনের ভার দেওয়া বৃথা। যিনি (বা যাঁরা) কর্মঠ ও বহুজ্ঞ, এমন লোককেই সম্পাদকপদে বরণ করতে হবে। সম্পাদক এবং সহকর্মী সকলকেই পরিমিত পারিশ্রমিক দিতে হবে, বেগারে কাজ চলবে না।

যদি জনকতক উৎসাহী সুশিক্ষিত লোক অগ্রণী হন তবে এই গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হতে পারবে। দু শ বৎসর আগে ফ্রান্সে কয়েকজন পণ্ডিত যার উদ্যোগ করেছিলেন এবং চার্চের

বশংবদ রাজশক্তির প্রবল বাধা সত্ত্বেও যা সমাপ্ত করেছিলেন, তার চাইতে অনেক ছোট একটি গ্রন্থ রচনা কি এই যুগের বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব ?

১৮৭৭

অশ্লীল ও অনিষ্টকর

আমরা সিনেমার কবলে পড়েছি। শহরের দেওয়াল অভিনেত্রীদের ছবিতে ছেয়ে গেছে, সমস্ত খবরের কাগজে সিনেমার বড় বড় সচিত্র বিজ্ঞাপন আর বিবরণ ছাপা হচ্ছে। মোটা মোটা মাসিক পত্রিকায় বিখ্যাত লেখকদের গল্পের ফাঁকে ফাঁকে সিনেমা-সুন্দরীদের ছবি গিজগিজ করছে। পূজার মণ্ডপে হিন্দী ফিল্‌ম-সংগীত নিনাদিত হচ্ছে। তারকাদের লীলাভূমি বোম্বাই এখন সিনেমাক্রান্ত ছেলেমেয়ের মক্কা-বারাণসী।

সম্প্রতি আমাদের হুঁশ হয়েছে—সিনেমা শুধু চিত্ত-বিনোদন করে না, অনেক ক্ষেত্রে চিত্তবিক্ষোভও করে। আপত্তিজনক ছবি আর বিজ্ঞাপন নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। পুলিসের কর্তারা নাকি বলছেন তাঁদের হাত-পা বাঁধা, সেনসর বোর্ড যা পাস করেন তার উপর কথা চলে না। শুধু এদেশে নয়, বিলাতেও অশ্লীল ছবির বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছে। গত নভেম্বরের World Digest পত্রিকায় Sidney Moseleyর একটি প্রবন্ধ থেকে এই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে—

By film, by television, by picture in the Press, we stir sexual emotions which are already astir in the normal human being. Do you wonder then, that some men, unable to resist

the effect of the glamorous presentations of sex which are continually thrust before them, go berserk and that all sorts of tragedies result? When you tempt men with drink or doxies the result is inevitable.

এর চাইতে কড়া সমালোচনা বোধ হয় এদেশে কেউ করেন নি। পাশ্চাত্ত্য দেশে কি রকম ছবি দেখানো হয় বা বিজ্ঞাপিত হয় তা ঠিক জানি না, তবে তার যেসব পোস্টার এখানে দেখা যায়, তা থেকে অনুমান করতে পারি যে ভারতীয় ছবির তুলনায় তা ঢের বেশী 'প্রগতিশীল'। এদেশের লোকমত এখনও পাশ্চাত্ত্যের মতন উদার আর নির্লজ্জ হয় নি। আমাদের আদর্শ কি হওয়া উচিত তাও স্থির করা সহজ নয়, কারণ অশ্লীলতার কোনও বহুসম্মত মানদণ্ড নেই। লোকমত কালে কালে বদলায়, দেশে দেশেও বিভিন্ন। স্ত্রী পুরুষ অল্পবয়স্ক আর পূর্ণবয়স্কের পক্ষে কি অবদ্য বা অনবদ্য তারও বিচার এক পদ্ধতিতে করা যায় না।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কিছু অশ্লীলতা আছে। তার দোষ ক্ষালনের জন্য Horace Heyman Wilson বহুকাল পূর্ব্বে লিখেছেন—

These men wrote for men only; they never think of a woman as a reader. What is natural, cannot be vicious; what everyone knows, surely

everyone may express ; and that mind which is only safe in ignorance or which is only defended by decorum, possesses but a very feeble and impotent security.

অর্থাৎ যে বিষয়ের আলোচনা নারীর পক্ষে অশোভন, তা পুরুষের পক্ষে বিহিত হতে পারে। যা স্বাভাবিক, তা মন্দ হতে পারে না। যা সকলেই জানে, তা সকলেই প্রকাশ করতে পারে। যে মনকে অজ্ঞতা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয় অথবা শালীনতা দিয়ে রক্ষা করতে হয়, সে মন অত্যন্ত দুর্ব্বল, তার আত্মরক্ষার শক্তি নেই।

ভক্ত বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে গীতগোবিন্দ উপাদেয় গ্রন্থ, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি অনেক মনীষী তার বিলাস বর্ণনায় কুরুচি পেয়েছেন। ভারতচন্দ্রের রচনায় এবং প্রাচীন বাঙলা কাব্যে যে আদিরস আছে, তা আধুনিক শিক্ষিত পাঠকের দৃষ্টিতে অশ্লীল, কিন্তু সেকালে কেউ তার দোষ ধরত না। পাঁচালি তরজা কবির লড়াই প্রভৃতির অশ্লীলতা ইতর ভদ্র সকলে উপভোগ করত। প্রাচীন পাশ্চাত্ত্য লেখকদের অনেকে নিরঙ্কুশ ছিলেন। শেকস্পীয়রের Venus and Adonisএর তুলনায় কালিদাস জয়দেব ভারতচন্দ্র প্রভৃতির আদিরসাত্মক রচনা যেন শিশুপাঠ্য। Don Quixote গ্রন্থে একটি সরাইএর বর্ণনায় যে কুৎসিত বীভৎসতা আছে তা প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

বিলাতে ভিক্টোরীয় যুগের ভদ্রশ্রেণী কিছু prude বা শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন, সাহিত্যে আর প্রকাশ্য সামাজিক আচরণে তার প্রভাব পড়েছিল। ইংরেজের শিষ্য বাঙালী লেখকরা সেই ভিক্টোরীয় শুচিতা আদর্শরূপে মেনে নিয়েছিলেন। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য থেকে লজ্জা প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে, বাঙলা সাহিত্যও কিছু অসংবৃত হয়েছে, কিন্তু ইংরেজীর তুলনায় পিছিয়ে আছে। খ্যাতনামা জনপ্রিয় ইংরেজ লেখকদের রচিত লোকসাহিত্যে এমন বর্ণনা দেখা যায়, যা আধুনিক বাঙলা গ্রন্থে থাকলে লেখক আর প্রকাশককে আদালতে দণ্ড পেতে হবে।

উপরে উইলসনের যে অভিমত দিয়েছি তা যুক্তিসম্মত হলেও সকল সমাজে গ্রহণীয় হবার সম্ভাবনা নেই। অশ্লীলতার মোটা-মুটি লক্ষণ— যা কামের উদ্দীপক অথবা উদ্দীপক না হলেও যা প্রচলিত রুচিতে কুৎসিত বা অশালীন গণ্য হয়। সামাজিক প্রথার সঙ্গে শালীনতার নিবিড় সম্বন্ধ আছে। ভিক্টোরীয় যুগে ভদ্র নারীর decollete সজ্জা (অর্ধমুক্ত বক্ষ) ফ্যাশনসম্মত ছিল (এখনও আছে), কিন্তু অনাবৃত ankle বা পায়ের গোছ অশ্লীল গণ্য হত এবং পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এখন ankle প্রদর্শন রুচিসম্মত হয়েছে, পুরুষের লোভও প্রায় লোপ পেয়েছে। আমাদের দেশে নারীচরণের নিম্নভাগ কোনও কালেই কামোদ্দীপক গণ্য হয় নি। প্রাচীন ভারতীয় কবিরা পুরুষের দেহসৌষ্ঠব বর্ণনায় যেমন ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ

লিখেছেন তেমনি সুন্দরীর রূপ বর্ণনায় পীনপয়োধরা ক্ষীণমধ্যা নিবিড়নিতম্বা করভোরু প্রভৃতি বিশেষণ দিয়েছেন। দেবীস্তোত্রেও এই সব লক্ষণ বর্জিত হয় নি। What is natural cannot be vicious— Wilsonএর এই সিদ্ধান্ত আমাদের প্রাচীন কবিরা বিলক্ষণ মানতেন। কিন্তু কালক্রমে এদেশে রুচির পরিবর্তন হয়েছে, নারীর রূপবর্ণনা এখন প্রাচীন রীতিতে করলে চলে না, একটু রেখে ঢেকে সংবৃতভাবে করতে হয়।

অনাত্মীয় পুরুষকে ভদ্র নারীর মুখ দেখানো নিরাপদ নয়, অর্থাৎ তা অশ্লীল— এই ধারণা থেকে ঘোমটা বোরখা অবরোধ অসূর্যম্পশ্যতা ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু তাতে অভীষ্ট ফল লাভ হয় নি। লোকে বহুকাল থেকে যা অনাবৃত দেখে তার সম্বন্ধে দুষ্ট বা morbid কৌতূহল হয় না, যা আবৃত তার প্রতিই আকৃষ্ট হয়। ৬০।৭০ বৎসর আগে অতি অল্প বাঙালী মেয়ে স্কুল-কলেজে যেত। তাদের সম্বন্ধে অল্পবয়স্ক পুরুষদের দুষ্ট কৌতূহল ছিল। কিশোরী আর যুবতী নূতন ধরনে শাড়ি পরে জুতো পায়ে দিয়ে হাতে বই নিয়ে খুটখুট করে চলেছে— এই অভিনব দৃশ্যে অনেকের চিত্তবিকার হত, সেজন্য মেয়েদের পায়ে হেঁটে যাওয়া নিরাপদ গণ্য হত না। এখনকার পুরুষেরা পথচারিণীদের সহজভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ সর্বকালে সর্বদেশেই আছে, তাই মাঝে মাঝে মেয়েদের অপমান সইতে হয়। শিস, অশ্লীল গান বা ঠাট্টা, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি ধর্ষণেরই অনুকল্প।

অনিষ্টকর না হলেও অনেক বিষয় শিষ্ট রুচির বিরোধী বা কুৎসিত গণ্য হতে পারে। ভাতার শব্দ ভর্তার অপভ্রংশ মাত্র, অর্থে গৌরব আছে, কামগন্ধ নেই। তথাপি শিষ্টজনের রুচিতে অশ্লীল। এই রকম অনেক শব্দ আছে, যার সংস্কৃত রূপ বা ডাক্তারী নাম শিষ্ট কিন্তু বাঙলা গ্রাম্য রূপ অশ্লীল গণ্য হয়। অনেক সময় অল্পবয়স্করা (এবং অনেক বৃদ্ধও) নিজেদের মধ্যে অশ্লীল আলাপ করে। বোধ হয় তাতে তারা নিষেধ লঙ্ঘনের আনন্দ পায়। যারা এরকম করে, তাদের দুশ্চরিত্র মনে করার কারণ নেই। মাতা ভগিনী কন্যা সম্পর্কিত কুৎসিত গালি যাদের মধ্যে চলিত আছে তারা অসভ্য হলেও দুর্বৃত্ত না হতে পারে। অশ্লীল বিষয়ের প্রভাবও সকলের উপর সমান নয়। এমন লোক আছে যারা সুন্দরী নারীর চিত্র বা প্রতিমূর্তি দেখলেই বিকারগ্রস্ত হয়। আবার এমন লোকও আছে যারা অত্যন্ত অশ্লীল দৃশ্য দেখে বা বর্ণনা শুনেও নির্বিকার থাকে।

সামাজিক সংস্কার অনুসারে অতি সামান্য ইতরবিশেষে শ্লীল বিষয়ও অশ্লীল হয়ে পড়ে। কোথায় পড়েছি মনে নেই— এক পাশ্চাত্ত্য চিত্রকর একটি নগ্ন স্ত্রীমূর্তির sketch এঁকে তাঁর বন্ধুকে দেখান। বন্ধু বললেন, অতি অশ্লীল। চিত্রকর বললেন, তুমি কিছুই বোঝ না, অশ্লীল কাকে বলে এই দেখ। এই বলে চিত্রকর মূর্তির পায়ে জুতো এঁকে দিলেন। বন্ধু তখন স্বীকার করলেন, চিত্রটি আগে নির্দোষ ছিল, এখন বাস্তবিকই অশ্লীল হয়েছে।

অনিষ্টকর না হলেও অনেক বিষয় কেন কুৎসিত গণ্য হয় তার ব্যাখ্যান নৃবিজ্ঞানী anthropologist আর মনোবিজ্ঞানীরা করবেন। আমাদের শুধু মেনে নিতে হবে যে নানারকম taboo সব সমাজেই আছে এবং তা লঙ্ঘন করা কঠিন, যদিও কালক্রমে তার রূপান্তর হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে মেয়েদের অভিনয় আর নাচের প্রবর্তন করেন তখন তাঁকে বিস্তর গঞ্জনা সইতে হয়েছিল। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে রুচি আর শালীনতার ধারণাও বদলায়। ২৫।৩০ বৎসর আগে কেউ ভাবতেও পারত না যে উচ্চশ্রেণীর বাঙালী কুলললনা বক্ষ আর পৃষ্ঠ অর্ধমুক্ত আর কক্ষ প্রকটিত করে পরপুরুষের বাহুলগ্না হয়ে বল নাচে মেতেছে। ভদ্র পুরুষের নটবৃত্তিতে আমরা বহুকাল থেকে অভ্যস্ত। কিন্তু ভদ্র নারী সিনেমায় নেমে বহুজনপ্রিয়া রূপবিলাসিনী হবে এবং প্রচুর প্রতিপত্তি পাবে—এও ২৫।৩০ বৎসর আগে কল্পনাতীত ছিল। অচির ভবিষ্যতে বাঙালীর 'হোটেলে' বা রেস্তোরাঁতে হয়তো cabaretএর ব্যবস্থা হবে এবং তাতে মেয়েরা নাচবে।

প্রায় দু শ বৎসরের ব্রিটিশ রাজত্বে আমাদের সমাজে ধীরে ধীরে বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাধীনতা লাভের পরে যেন পরিবর্তনের প্লাবন এসেছে, দেশের লোক অত্যন্ত আগ্রহে বিলাতী আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করছে। ভবিষ্যৎ বাঙালী তথা ভারতীয় সমাজ পাশ্চাত্ত্য সমাজের নকলেই গড়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের প্রগতিতে অর্থাৎ সাহেবীভবনে

যে বিলম্ব হচ্ছে, তার প্রধান কারণ দারিদ্র্য, প্রাচীন সংস্কার নয়। যাঁরা ধনী তাঁদের অনেকে বহুদিন পূর্বেই ইঙ্গবঙ্গ সমাজ স্থাপন করেছেন। জাপানে যা হয়েছে ভারতেও তা না হবে কেন? পাশ্চাত্ত্য বীর্য উদ্যম কর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণ না পেলেও ক্ষতি নেই, পাশ্চাত্ত্য রীতি নীতি ফ্যাশন ব্যসন যথাসাধ্য আত্মসাৎ করতেই হবে, তাই আমাদের পরম পুরুষার্থ।

মহা বাধা আমাদের দারিদ্র্য। টাকার জোরে এবং শখের প্রাবল্যে অল্প কয়েকজন ভাগ্যবান শীঘ্রই পূর্ণমাত্রায় সাহেব হয়ে যেতে পারবে, কিন্তু মধ্যবিত্ত আর অল্পবিত্ত সকলকেই লোভের মাত্রা কমিয়ে নিজের সামর্থ্যের উপযোগী আধা বা সিকি-সাহেবী সমাজে তুষ্ট হতে হবে। আমাদের রুচি আর শালীনতাও এই মধ্যাল্পবিত্ত সমাজের বশে নিরূপিত হবে।

এদেশের যাঁরা নিয়ন্তা, অর্থাৎ বিধানসভা ইত্যাদির সদস্য, তাঁদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বা অল্পবিত্ত। অশ্লীলতা দমন এঁদেরই হাতে। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণমাত্রায় পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন নয়, ইওরোপ আমেরিকার রুচি এঁরা অন্ধভাবে মেনে নিতে পারবেন না। অতএব আশা করা যেতে পারে, অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতবাসীর রুচি অনুসারেই এঁরা শ্লীলতা বা অশ্লীলতা, নিরাপত্তা বা অনিষ্টকারিতা বিচার করবেন এবং তদনুসারে সিনেমার ছবি আর বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রিত করবেন।

কোনও সাহিত্যিক রচনা ভাল কি মন্দ তার বিচার সমালোচকরা ধীরে সুস্থে করেন। তাঁদের মানদণ্ড অনির্দেশ্য,

সকলে তা প্রয়োগ করতে পারে না। যদি বিদগ্ধতার খ্যাতি থাকে তবে পাঠক-সাধারণ তাঁদের অভিমতই মেনে নেয়। মত প্রকাশে দেরি হলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু সিনেমা-ছবির নির্বাচন অবিলম্বে করতে হয়, সেনসর-বোর্ড বেশী সময় নিতে পারেন না। তাঁরা কিরকম মানদণ্ড অনুসারে শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিচার করবেন ?

সেনসর-বোর্ডের সদস্যদের রুচি যদি মোটামুটি একরকম হয় তবে বিচার কঠিন হবে মনে করি না। তাঁদের অতিমাত্রায় উদার না হওয়াই উচিত। যদি তাঁরা মনে করেন, কোনও ছবি দেখে এক শ দর্শকের মধ্যে দশজনের চিত্তবিকার হতে পারে তবে সে ছবি মঞ্জুর করবেন না। মনোবিজ্ঞানীরা যাকে psycho-somatic effect বলেন, অর্থাৎ মানসিক উত্তেজনার ফলে দৈহিক বিকার (পূর্বে উদ্ধৃত Sydney Moseleyর উক্তিতে তারই ইঙ্গিত আছে)— তার সম্ভাবনা থাকলে সে ছবি অবশ্যই বর্জন করবেন। বিদেশে সে ছবি দেখানো হয় কিনা, ভারতের অন্য প্রদেশের সেনসর-বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে কিনা— তা ভাববার দরকার নেই। যা তাঁদের নিজের বিচারে অবাঞ্ছিত, এখানকার সেনসর-বোর্ড তা অবশ্যই নিষিদ্ধ করবেন।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেন, পরিবারের সকলে যে ছবি একসঙ্গে দেখতে পারে শুধু সেই ছবিই মঞ্জুর করা উচিত, প্রাপ্তবয়স্ক আর অল্পবয়স্কর জন্যে ভেদ রাখা অন্যায়।

এই প্রস্তাব অতি সমীচীন। কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য— এই কথা বিজ্ঞাপনে লিখলেই অল্পবয়স্কদের লোভ বাড়ানো হয়।

আর্টের অসংখ্য উপাদানের মধ্যে কিঞ্চিৎ কামকলার প্রয়োজন থাকতে পারে। সিনেমা আর সাহিত্যে তার প্রয়োগ যদি সংযত করা হয় তবে আর্ট আর সংস্কৃতি চর্চার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না।

১৮৮০

পরিপূর্ণ সাহিত্য

রোজগার বললে অধিকাংশ বাঙালী বোঝে চাকরি। ওকালতি ডাক্তারি ঠিকাদারি দালালি ব্যবসা ইত্যাদি রোজগার হলেও অগ্রগণ্য নয়, সাধারণ ভদ্রসন্তানের দৃষ্টিতে চাকরিই সর্বোত্তম জীবিকা। সেই রকম, সাহিত্য বললে অধিকাংশ বাঙালী বোঝে প্রধানত গল্প-উপন্যাস, তার পর কবিতা, তার পর লঘু প্রবন্ধ বা রম্যরচনা। ইংরেজীতে literature অর্থে অনেক রকম রচনা বোঝায়, কিন্তু বাঙলায় সাহিত্য শব্দ অতি সংকীর্ণ অর্থে চলে। অমুক একজন সাহিত্যিক এ কথার মানে, লোকটি গল্প উপন্যাস বা কবিতা লেখেন অথবা তার সমালোচনা করেন।

অনেকে বলেন, বাঙলা কথাসাহিত্য এখন ইংরেজীর সমকক্ষ এবং বাঙলা ভাষা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার চাইতে অনেক এগিয়ে আছে। কথাটা হয়তো সত্য, কিন্তু সেজন্যে আমাদের বেশী আত্মপ্রসাদের কারণ নেই। শুধু গল্প-উপন্যাস নয়, সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যের তুলনায় সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অবস্থা কি রকম তা ভাবা দরকার।

স্কুল-কলেজের টেক্স্ট-বুক, শিশুপাঠ্য গল্প-কবিতা, ওকালতি ডাক্তারি ইত্যাদি কর্ম সংক্রান্ত পুস্তক, রাজ্যশাসন সংক্রান্ত নানা-রকম বিধিগ্রন্থ— এই সব ছাড়া যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাই বয়স্থ

জনসাধারণ অবসরকালে পড়ে। তা থেকেই আধুনিক বাঙালী লেখক আর পাঠকের সাহিত্যিক রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত রচনা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে— উদ্‌ভাবী (বা কাল্পনিক) আর ভাবাত্মক অর্থাৎ creative আর emotional রচনা। গল্প উপন্যাস কবিতা ভক্তিগ্রন্থ ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত এবং এই সবেরই পাঠক বেশী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে— জ্ঞানাত্মক আর বাস্তব-বিষয়ক অর্থাৎ informative আর factual রচনা। এই শ্রেণীর উদাহরণ— বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব', রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর, বিশ্বপরিচয়', রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা, বিচিত্র জগৎ', চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বিশ্বের উপাদান', বিনয় ঘোষের 'পশ্চিম-বঙ্গের সংস্কৃতি', সমরেন্দ্রনাথ সেনের 'বিজ্ঞানের ইতিহাস।' প্রথম শ্রেণীর তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থসংখ্যা অনেক কম, পাঠকও কম। এসব বইএর বারো মাসে তেরো সংস্করণ হবার কোন আশা নেই।

ইংরেজী প্রভৃতি সমৃদ্ধ ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পত্রিকা আছে, যেমন, গল্প-উপন্যাস, কবিতা, দেশ-ভ্রমণ, সার-সংকলন বা digest, খেলা, বিভিন্ন বিজ্ঞান ও দর্শন ইত্যাদি, বাঙলা পত্রিকার বৈচিত্র্য বেশী নেই, সাধারণ মাসিক আর সাপ্তাহিক পত্রিকায় সব রকম জনপ্রিয় রচনা ছাপা হয়। এইসব পত্রিকায় নানারকম বইএর যে বিজ্ঞাপন থাকে তা থেকেই বাঙলা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থার আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে।

আমার অনুরোধে statisticsএর একটি ছাত্র অনেকগুলি বিজ্ঞাপন থেকে একটি মোটামুটি পরিসংখ্যান খাড়া করেছেন। তাঁর হিসাব অনুসারে বিজ্ঞাপিত বিভিন্ন শ্রেণীর বইএর শতকরা হার এই রকম :—

গল্প, উপন্যাস এবং তার আলোচনা	৭৫
কবিতা, নাটক এবং তার আলোচনা	৫
ভক্তিগ্রন্থ	৬
চরিতকথা, স্মৃতিকথা	৪
ভ্রমণকথা, স্থান-বিবরণ	২
ইতিহাস	২
রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব	২
অর্থনীতি, কৃষি, বাণিজ্য শিল্প	১এর কম
দার্শনিক বিষয়	১
বৈজ্ঞানিক বিষয়	১এর কম
ফলিত জ্যোতিষ, অলৌকিক বিষয়	১
অন্যান্য বিবিধ বিষয়	১

এই ফর্দ থেকে বোঝা যায় যে বাঙলা সাহিত্যের শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগ উদ্‌ভাবী বা কাল্পনিক এবং ভাবাত্মক রচনা। ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যেও গল্প-উপন্যাসাদির সংখ্যা বেশী, কিন্তু জ্ঞানাত্মক গ্রন্থের অনুপাত এদেশের মতন অত্যল্প নয়।

সংস্কৃত শাস্ত্রে চৌষট্টি কলার উল্লেখ আছে, তার কতকগুলি ইংরেজী art সংজ্ঞার অন্তর্গত। যেমন গীত বাদ্য নৃত্য নাট্য

আলেখ্য তক্ষণ। ইংরেজীতে গল্প আর কাব্য-রচয়িতাও আর্টিস্টরূপে গণ্য হন, বাঙলাতেও তাঁদের কলাবিৎ বলা চলে। যাঁরা ছবি আঁকেন, মূর্তি গড়েন, গীত-বাদ্য-নৃত্য বা অভিনয় করেন তাঁরা যেমন আর্টিস্ট, গল্প-উপন্যাস আর কবিতার লেখকও তেমনি আর্টিস্ট বা কলাবিৎ। এঁদের সকলেরই রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্তবিনোদন। যাতে বিনোদনের সঙ্গে মনের উৎকর্ষ আর অনুভূতির প্রসার হয় সেই রচনাই অবশ্য প্রকৃষ্ট। সকল দেশেই সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ আর্ট বা কলাচর্চা।

সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে কথাসাহিত্য কাব্য সংগীত নাট্য চিত্রকলা প্রভৃতি অপরিহার্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কলাচর্চাই সংস্কৃতির সবটা নয়। উদ্‌ভাবী বা কাল্পনিক, এবং ভাবাত্মক, creative আর emotional সাহিত্যে সব প্রয়োজন মেটে না, জ্ঞানাত্মক আর বাস্তব বিষয়ক সাহিত্যও অপরিহার্য। এই জাতীয় সাহিত্য বাঙলায় যথেষ্ট নেই।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন, জ্ঞানাত্মক বাস্তব বিষয়ের চর্চা তো স্কুল-কলেজেই চুকে গেছে, প্রৌঢ় আর বৃদ্ধ বয়সেও যদি তার জের টানতে হয় তবে জীবন দুর্বহ হবে। এ রকম মনোভাব ঠিক নয়। শিক্ষার শেষ নেই, আজীবন তা চলে। ঠেকে শেখা শুনে শেখা আর দেখে শেখার সুযোগ সকল ক্ষেত্রে মেলে না, তাই যত কাল সামর্থ্য তত কালই পড়ে শিখতে হয়। মানুষের যে জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা পুরাকাল থেকে সংগৃহীত হয়ে আসছে তা শুধু বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের সংরক্ষিত

গুহ্য বিদ্যা নয়, জনসাধারণের সাহিত্যেও যথাসম্ভব মনোজ্ঞ ভাষায় তাকে স্থান দিতে হবে।

টেক্স্‌ট-বুক প্রায় নীরস রচনা, পরীক্ষা পাসের জন্যেই ছেলে-মেয়েরা তা পড়ে। সে রকম লেখা বয়স্থ লোকের উপযুক্ত নয়। শুধু তথ্য থাকলেই চলবে না, রচনা চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই, তবেই সাধারণ পাঠকের পড়বার আগ্রহ হবে। ইংরেজীতে এই জাতীয় গ্রন্থ বিস্তর আছে, পাঠকও অসংখ্য। উদাহরণ আর আদর্শস্বরূপ কয়েকটি গ্রন্থের নাম করছি।—

H. G. Walesএর Short History of the World, সদ্য প্রকাশিত Julian Huxleyর Story of Evolution, M. Davidsonএর Easy Outline of Astronomy, Gilbert Murryর Myths and Ethics, A. N. Whiteheadএর Science and the Modern World, নির্মলকুমার বসুর Cultural Anthropology.

বাঙলায় এই জাতীয় গ্রন্থ নেই এমন নয়, কিন্তু যথেষ্ট নেই। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ নামে বিশ্বভারতী অনেকগুলি জ্ঞানগর্ভ ছোট বই প্রকাশ করেছেন। শুনেছি এই গ্রন্থমালার ক্রেতা অনেক কিন্তু পাঠকও অনেক কিনা জানি না।

বাঙলা গল্প কাব্য আর ভক্তিগ্রন্থ সংখ্যায় এবং উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ হতে পারে, কিন্তু অন্যান্য রচনায় হিন্দী এগিয়ে যাচ্ছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশের অনেক বৎসর আগেই হিন্দী অনুবাদ ছাপা হয়েছে। ভারতের প্রাকৃতিক আর

শিল্পজাত দ্রব্যের বিবরণেও হিন্দী অগ্রণী। বাঙলার তুলনায় হিন্দীভাষীর সংখ্যা অনেক বেশী, হিন্দী বই-এর পাঠকও বেশী। বিহার উত্তরপ্রদেশ পঞ্জাব রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ— এই সকল রাজ্যে হিন্দী সাহিত্যের উন্নতির জন্যে প্রচুর সরকারী সাহায্য আর উৎসাহ দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পোষকতা তো আছেই। এ সবের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সরকারী সাহায্য অতি অল্প। আমাদের অপূর্ণ সাহিত্যকে পূর্ণতা দেবার জন্যে লেখক প্রকাশক পাঠক আর সরকার সকলকেই অবহিত হতে হবে। বাঙলা সাহিত্য চিরকালই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হয়ে থাকুক এমন স্পর্ধা করতে বলি না, কিন্তু বাঙলা সাহিত্য সকল বিভাগে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক এই কামনা বাঙালী মাত্রেরই করা উচিত।

১৮৮১

রচনা ও রচয়িতা

আমরা যেসব বস্তু নিত্য ব্যবহার করি তার অধিকাংশের উদ্দেশ্য জীবনযাত্রার স্থূল প্রয়োজন মেটানো। এইসব বস্তুর কতকগুলি অতি প্রাচীন, তাদের উদ্‌ভাবক বা প্রবর্তকের নাম আমাদের জানা নেই। যেমন তীর-ধনুক, পোড়ামাটির বাসন, গাড়ির চাকা, কাপড় বোনার তাঁত ইত্যাদি। কতকগুলি বস্তুর প্রবর্তকের নাম আমরা জানি এবং সসম্মানে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। কিন্তু তাঁদের প্রবর্তিত বস্তুর পরিবর্তন করতে আমাদের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না, তাতে তাঁদের মর্যাদাহানি হবে তাও মনে করি না। আমরা চাই, যা কাজের জিনিস তা আরও কাজের উপযুক্ত হক, আরও ভাল হক। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত প্রথম ব্যাকরণের জন্যে পাণিনির নাম জগদ্‌বিখ্যাত, কিন্তু পরবর্তী ব্যাকরণকারগণ পাণিনির অন্ধ অনুকরণ করেন নি। প্রথম বিজলী বাতির উদ্‌ভাবক এডিসন এবং প্রথম সার্থক এয়ারোপ্লেনের নির্মাতা রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, কিন্তু তাঁদের নির্মিত বস্তুর সঙ্গে আধুনিক বস্তুর সাদৃশ্য খুব কম।

নিত্যব্যবহার্য জিনিসের উপযোগিতা বা utilityই অগ্রগণ্য, তার উদ্‌ভাবকের কীর্তি অতি গৌণ। কে প্রথমে তৈরি করেছিলেন তা অনেকেই জানে না, যারা জানে তারাও ব্যবহারকালে স্মরণ করে না। কিন্তু যেসব বস্তুর মুখ্য উদ্দেশ্য

আনন্দদান অথবা ভাব বা রসের উৎপাদন, তার সঙ্গে রচয়িতার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। রচয়িতা যদি অজ্ঞাত হন তথাপি তাঁর কৃতির উপর অন্যের হস্তক্ষেপ স্যাক্রিলেজ তুল্য অপরাধ গণ্য হয়। কেউ যদি অ্যাপোলো বেলভিডিয়ার বিগ্রহ বা অশোকস্তম্ভের সিংহমূর্তি আরও ভাল করে গড়তে চায়, কিংবা কালিদাস শেক্সপীয়ার রবীন্দ্রনাথের রচনার সংস্কার করতে চায়, তবে সে উন্মাদ গণ্য হবে।

বেদের এক নাম শ্রুতি, কারণ গুরুশিষ্যপরম্পরায় মুখে মুখে আর শুনে শুনে বেদাধ্যয়ন হত। প্রাচীন ভারতের লিপির প্রচলনের পরেও বেদাভ্যাসের এই পদ্ধতি বজায় ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা সহজে প্রশংসা করেন না, কিন্তু তাঁরাও মেনেছেন যে অন্তত তিন হাজার বৎসর যাবৎ বেদবিদ্যা মুখে মুখেই চলে আসছে এবং অপরিবর্তিত আছে। শুধু তার বাক্য নয়, উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ভেদে তার উচ্চারণ বা পঠনরীতিও প্রায় যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। এই আশ্চর্য ঘটনার কারণ, বেদের প্রতি ভারতবাসীর অসীম শ্রদ্ধা। বাঙলা দেশে বেদচর্চা প্রায় লোপ পেয়েছিল, সেজন্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিতকে শুদ্ধ পাঠ শেখবার জন্যে কাশী পাঠিয়েছিলেন। এখনও ব্রাহ্ম উপাসনায় প্রাচীন রীতিতে উপনিষদাদির শ্লোক উচ্চারিত হয়।

শুধু বেদ নয়, সংস্কৃত কাব্য পাঠের রীতিও অতি প্রাচীন এবং সর্বত্র প্রায় একরকম। কিন্তু বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণে

বিকার এসেছে। শুনেছি কোনও এক পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, সংস্কৃত বাক্য রচনার যেমন গৌড়ী আর বৈদর্ভী রীতি আছে তেমনি বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণকে গৌড়ী রীতি রূপে মেনে নিতে দোষ কি? এই উক্তির জন্য তিনি ধমক খেয়েছিলেন। আমরা সংস্কৃত কবিতা সুর করে পড়তে জানি না, নীরস গদ্যের মতন পড়ি; কিন্তু ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে সুর করে পড়াই রীতি। বিহারী উত্তরপ্রদেশী মরাঠী গুজরাটী এবং দ্রাবিড় পণ্ডিতরা প্রায় একই সুরে সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করেন। এই চিরাগত রীতির কারণও সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ।

আমাদের দেশের অনেক ওস্তাদ মনে করেন, গান-বাজনা গুণিজনের স্বচ্ছন্দ বিহার বা কসরতের ক্ষেত্র, যদি নির্দিষ্ট সুর আর তাল মোটামুটি বজায় রাখা হয় তবে কর্তব বা সুর ভাঁজায় গায়কের চিরন্তন অধিকার আছে। গান যদি বেওয়ারিস হয় কিংবা গানের বাক্য যদি তুচ্ছ আর সুরের বাহন মাত্র হয় তবে কর্তবে আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু রচয়িতা যদি কবিতার সঙ্গে তাল মান লয় যোগ করে গান রচনা করেন তবে তার অলংকরণের অধিকার গায়কের থাকে না। কালিদাস পার্বতী-পরমেশ্বরকে বাগর্থ তুল্য সম্পৃক্ত বলেছেন। কবি যখন গান রচনা করেন তখন বাক্ আর অর্থের সঙ্গে সুরও সম্পৃক্ত করেন, অর্থাৎ কবিরচিত গানে কবিতার সঙ্গে সুরের অচ্ছেদ্য ও অপরিবর্তনীয় বন্ধন ঘটে।

রবীন্দ্রকাব্যের বাক্যের পরিবর্তন যেমন গর্হিত, রবীন্দ্র-সংগীতের সুরের পরিবর্তন বা অলংকরণও তেমনি গর্হিত। মনালিসার বাঁকা হাসি যদি ভাল না লাগে তবে অতি বড় চিত্র-বিশারদেরও তা সোজা করার অধিকার নেই। যিনি মনে করেন, নির্দিষ্ট রীতিতে না গেয়ে রবীন্দ্রসংগীত আরও শ্রুতিমধুর করে গাওয়া যেতে পারে, তাঁর উচিত অন্য গান রচনা করে তাতে নিজের সুর দেওয়া।

১৮৮১

স্নেহদ্রব্য

বাঙালীর রান্নায় সরষের তেল আর ঘি বহুকাল থেকে চলে আসছে। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে পঞ্জাবী আর উত্তরপ্রদেশীকে বলতে শুনেছি, সরষের তেল খেলে পেট জ্বলে যায়, কিন্তু এখন তারাও খেতে আরম্ভ করেছে। গান্ধীজী বলতেন, লংকা আর সরষের তেল বিষবৎ ত্যাজ্য। কিন্তু লংকাখোর দক্ষিণভারতবাসীর জঠর এপর্যন্ত দগ্ধ হয় নি, বাঙালীর জঠরও সরষের তেলে স্নিগ্ধ আছে, যদিও কেউ কেউ বিষাক্ত ভেজাল তেল খেয়ে রোগে পড়েছেন।

'বনস্পতি' নাম কোন্ মহাপণ্ডিত চালিয়েছেন জানি না। সরকার এই উৎকট নাম মেনে নিয়েছেন। এর আভিধানিক অর্থ— পুষ্পব্যতিরেকে ফলজনক বৃক্ষ, অশ্বত্থাদি; বৃক্ষ মাত্র। (শব্দসার)। হিন্দীতে বনস্পতি মানে উদ্‌ভিদ। যদি সেই অর্থই ধরা হয় তা হলেও উদ্‌ভিজ্জ তৈলজাত দ্রব্যবিশেষের নাম বনস্পতি হবে কেন? গরু থেকে দুধ হয়, দুধ থেকে ঘি। সে কারণে ঘিকে গরু বলা চলে কি? এই প্রবন্ধে হাইড্রোজেনেটেড অয়েলকে সংক্ষেপে হাইড্রোতেল বলব। বিভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত এই দ্রব্য 'ডালডা, রসোই, কুসুম, পকাও' ইত্যাদি নানা নামে বিক্রি হয়।

গত যুদ্ধের আগে ঘি আর সরষের তেলের যে দাম ছিল

এখন তার পাঁচ-ছ গুণ হয়েছে। হাইড্রোতেল প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে বিদেশ থেকে আসতে আরম্ভ করে। প্রথম প্রথম হোটেলের রান্নায়, ময়রার ভিয়ানে, আর ঘিয়ের ভেজালে চলত, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ তা পছন্দ করত না, যদিও দাম ছিল দশ আনা সেরের কাছাকাছি, অর্থাৎ ঘিএর অর্ধেক। অনেকে মনে করত, বস্তুটি অপকারী, অন্তত তার 'ফুড-ভ্যালু' কিছু নেই। হাইড্রোতেল সম্বন্ধে সাধারণের ভয় ক্রমশ দূর হল, গৃহস্বামীর আপত্তি থাকলেও গৃহিণীরা লুকিয়ে আনাতে লাগলেন। কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের কর্ত্রী আমাকে বলেছিলেন. কি করা যায় বলুন, ছেলেগুলো রাক্ষসের মতন লুচি খাচ্ছে, কাহাঁতক ঘি যোগাব ? (ঘি তখন পাঁচ সিকে সের)।

এখন এদেশে প্রচুর হাইড্রোতেল তৈরি হচ্ছে, জনকতকের আপত্তি থাকলেও জনসাধারণ বিনা দ্বিধায় খাচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি এই বস্তুটির বিরুদ্ধে নূতন অভিযোগ উঠেছে, এবং সবিশেষ জানবার জন্যে অনেকে আগ্রহী হয়েছেন। এই প্রবন্ধে তেল ঘি হাইড্রোতেল প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি।

স্নেহ (fat)

ইংরেজী ফ্যাট শব্দের অর্থ প্রাণিদেহের চর্বি, কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় মাখন ঘি আর উদ্‌ভিজ্জ তেলও ফ্যাট-এর অন্তর্গত। এই ব্যাপক অর্থে ফ্যাট-সংজ্ঞার প্রতিশব্দ রূপে অনেকে লেখেন, চর্বি বা চর্বি-জাতীয় দ্রব্য। ইংরেজী প্রয়োগের অন্ধ অনুকরণে

সরষে তিল ইত্যাদির তেলকে চর্বি বললে আমাদের সংস্কারের উপর পীড়ন হয়। বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে ফ্যাট-এর প্রতিশব্দ স্নেহ বা স্নেহদ্রব্য লেখাই ভাল, তাতে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা থাকবে না।।

স্নেহাম্ল (fatty acid)

স্নেহ শব্দের এক অর্থ, স্নিগ্ধতা, চিক্কণতা, বা তেলা ভাব। ভ্যাসেলিন, লুব্রিকেটিং অয়েল প্রভৃতিও চিক্কণ, কিন্তু তাদের রাসায়নিক গঠন স্নেহ বা ফ্যাটের তুল্য নয়। স্নেহ মাত্রেরই প্রধান উপাদান গ্লিসারিন এবং কয়েক প্রকার স্নেহাম্ল বা ফ্যাটি অ্যাসিড। রসায়ন শাস্ত্রে যাকে অম্ল বা অ্যাসিড বলা হয় তার স্বাদ টক নাও হতে পারে। অধিকাংশ স্নেহাম্ল টক নয়।

অপূরিত (unsaturated) ও **প্রপূরিত** (saturated)

প্রত্যেক স্নেহাম্লের অণুতে কতকগুলি কার্বন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণু থাকে। এই সব পরমাণুর বিন্যাস ও সংখ্যা এক-এক স্নেহাম্লে এক-এক প্রকার। এক শ্রেণীর স্নেহাম্লে আরও হাইড্রোজেন পরমাণু জুড়ে দিতে পারা যায়, অপর শ্রেণীতে তা পারা যায় না। প্রথম শ্রেণীকে বলা হয় অপূরিত (অনস্যাটুরেটেড), অর্থাৎ যতটা হাইড্রোজেন থাকতে পারে ততটা নেই, হাইড্রোজেনের কিছু আসন খালি আছে। অপর শ্রেণীর স্নেহাম্লকে বলা হয় প্রপূরিত (স্যাটুরেটেড), অর্থাৎ এগুলিতে পূর্ণমাত্রায় হাইড্রোজেন আছে, আসন খালি নেই।

বিভিন্ন তেলে আর ঘিএ যে স্নেহাম্ল থাকে তার মধ্যে অপূরিত আর প্রপূরিতের শতকরা হার মোটামুটি এই রকম—

	অপূরিত	প্রপূরিত
সরষের তেল	৫০	৫০
তিল তেল	৮৫	১৫
চীনাবাদাম তেল	৭৫-৮৭	২৫-১৩
নারকেল তেল	২	৯৮
ঘি (গাওয়া ভঁয়ষার কিছু তারতম্য আছে)	২৯	৭১

সরষে তিল আর চীনাবাদাম তেলে অপূরিত স্নেহাম্ল প্রচুর আছে, এই সব তেল শীতকালেও তরল থাকে। নারকেল তেল আর ঘিএ প্রপূরিত বেশী, ঠাণ্ডায় জমে যায়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন সংযোগ করলে অপূরিত স্নেহাম্ল প্রপূরিত হয়ে যায়, তার ফলে তরল তেল গাঢ় হয়। যোজিত হাইড্রোজেনের মাত্রা অনুসারে তেলের রূপ ঘিএর মতন নরম, ছাগল-ভেড়ার চর্বির মতন জমাট বা মোমের মতন শক্ত করা যায়। এদেশে ৯ ভাগ চীনাবাদাম তেলে ১ ভাগ তিল তেল মিশিয়ে তাই থেকে হাইড্রোতেল তৈরি হয়, কিন্তু সবগুলির গাঢ়তা সমান নয়। হাইড্রোতেলের কথা পরে হবে, এখন সাধারণ তেলের কথা বলছি।

কোন্ তেল ভাল ?

ভারতের অনেক প্রদেশে তিল আর চীনাবাদাম তেলে রান্না হয়, দক্ষিণ ভারতে নারকেল তেলও চলে। বাঙালী সহজে অভ্যাস বদলাতে পারে না। বারো-তেরো বৎসর আগে যখন সরষের তেল খুব দুষ্প্রাপ্য হয়েছিল তখন অনেকে জেনে শুনে ভেজাল তেল কিনত, কিন্তু তিল বা চীনাবাদাম তেল ছুঁত না। প্রচলিত তেলের মধ্যে কোন্‌টি বেশী হজম হয় বা বেশী পুষ্টিকর তার পরীক্ষা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত হয় নি, অতএব নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। আয়ুর্বেদে তিল তৈলের বহু প্রশংসা আছে, তৈল শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থই তিলজাত (যেমন oil-এর মৌলিক অর্থ olive-জাত)। সরষে তিল আর চীনাবাদাম তিন রকম তেলই অনেক কাল থেকে ভারতবাসীর রান্নায় চলছে, তাতে স্বাস্থ্যহানি হয়েছে এমন শোনা যায় নি। অতএব ধরা যেতে পারে যে তিনটি তেলই সুপাচ্য। অবশ্য এমন লোক আছে যার পেটে এক রকম তেল সয় কিন্তু অন্য রকম তেল সয় না, কিংবা ঘি সয় কিন্তু কোনও তেল সয় না। সব রকম তেলের চাইতে ঘি বেশী পাচ্য আর পুষ্টিকর, এ বিষয়ে মতভেদ নেই।

খাদ্যের রাসায়নিক গঠনের সঙ্গে তার পাচ্যতা আর পুষ্টিকরতার সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সেই সম্বন্ধ সকল ক্ষেত্রে সুনির্ণীত হয় নি। মোটামুটি দেখা যায়, স্নেহদ্রব্যের মধ্যে যেগুলি তরল এবং যাতে অপূরিত স্নেহাম্ল বেশী, সেইগুলিই সহজে জীর্ণ হয়।

ঘিএ প্রপূরিত স্নেহাম্ল বেশী থাকলেও তার লঘু গঠনের জন্য সুপাচ্য। তা ছাড়া ঘিএ ভাইটামিন এ আর ডি আছে, তেলে নেই। নারকেল তেলে প্রপূরিত স্নেহাম্ল খুব বেশী, কিন্তু তার কতকটা ঘিএর তুল্য।

পূর্বোক্ত তালিকায় বিভিন্ন তেলের যে স্নেহাম্ল দেখানো হয়েছে তাতে তিল তেলে অপূরিত স্নেহাম্ল সব চাইতে বেশী আর প্রপূরিত কম। এই কারণে অন্য তেলের তুলনায় সম্ভবত তিল তেল পাচ্যতায় শ্রেষ্ঠ, তার পরেই চীনাবাদাম তেল।

খাদ্যদ্রব্য ভাজবার সময় তেল বা ঘি তপ্ত করতে হয়। বেশী তাপে সব স্নেহদ্রব্যই বিকৃত হয় বা পুড়ে যায়, কিন্তু তেল যত আঁচ সইতে পারে, ঘি তত পারে না। সেজন্য প্রবাদ— তেল পুড়লে ঘি, ঘি পুড়লে ছাই। ঘি বেশী পুষ্টিকর হলেও ভাজবার পক্ষে তেলই ভাল, যদিও 'ঘিএ ভাজা তপ্ত লুচি'র খ্যাতি বেশী। চর্বি আর হাইড্রোতেলও বেশী আঁচ সইতে পারে।

ভাজবার সময় তেল-ঘিএর কিছু অংশ বাষ্পাকারে উবে যায়। ঘিএ সব চাইতে বেশী যায়, তিল তেলে আর নারকেল তেলে একটু কম, সরষে আর চীনাবাদাম তেলে আরও কম। এই কারণে ভাজবার পক্ষে সরষে আর চীনাবাদাম তেল শ্রেষ্ঠ। সরষের তেলের দুর্লভতার সময় আমি তিন-চার মাস তিল তেল চালিয়েছিলাম, তার ফলে রান্নাঘরের দেওয়াল তৈলাক্ত হয়ে যায়।

খাদ্য সম্বন্ধে অকারণ পক্ষপাত বা বিদ্বেষ ভাল নয়। পশ্চিম

বাঙলার খাদ্যসংকটের একটি কারণ— রুটিতে আপত্তি আর ভাতে অত্যাসক্তি। যে সব খাদ্য অন্য প্রদেশে খুব চলে তা বাঙালীরও অভ্যাস করা উচিত। প্রত্যেক তেলেরই বিশিষ্ট গন্ধ আছে। সরষের তেল না হলে চলবে না, অন্য তেলের গন্ধ খারাপ, এমন মনোভাব ক্ষতিকর। অভ্যাস করলে তিল আর চীনাবাদাম তেলেও রুচি হবে।

হাইড্রোতেল

ঘিএর উপর ভারতবাসীর যে আসক্তি আছে তা অন্যায় নয়, কারণ অন্য স্নেহদ্রব্যের চাইতে ঘিএর পুষ্টিকরতা বেশী। জল আর বাতাসের সংস্পর্শে, পুরনো হলে, এবং বার বার তপ্ত করলে ঘি আর তেল বিকৃত হয়। ঘিএর উপর সাধারণের পক্ষপাত আছে, তাই খারাপ ঘি দিয়ে তৈরী খাবারে একটু দুর্গন্ধ থাকলে লোকে গ্রাহ্য করে না, বরং সেই গন্ধকেই ঘৃতপক্কতার প্রমাণ মনে করে। ঘি আভিজাত্যের লক্ষণ, মান্য কুটুম্ব বা অতিথিকে তেলে ভাজা খাবার দেওয়া যায় না। খাঁটী ঘি দুর্মূল্য হলে লোকে সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে সস্তা ভেজাল দেওয়া ঘি কেনে। ঘিএর কৃত্রিম এসেন্স বাজারে পাওয়া যায়, হাইড্রোতেলে অল্প একটু দিলে পচা ঘিএর মতন গন্ধ হয়। অনেক দোকানের 'বিশুদ্ধ ঘৃতের খাবার' এই নকল ঘিএ তৈরী হয়। গৃহস্থের যে চক্ষুলজ্জা আগে ছিল এখন তা দূর হয়েছে, নকল ঘি কিনে আত্মবঞ্চনা বা অতিথিবঞ্চনার দরকার হয় না, খোলাখুলি

হাইড্রোতেলে রান্না হয়। তেলে ভাজা খাবারে যে গন্ধ হয় তা হাইড্রোতেলের খাবারে থাকে না, সেজন্য ঘৃতপক্কের বিকল্পরূপে হাইড্রোতেলপক্ক খাবার অবাধে চলে।

হাইড্রোতেলে ঘি-ব্যবসায়ীর ক্ষতি

অনেকে বলেন, হাইড্রোতেলে ঘিএর সর্বনাশ হচ্ছে, এর উৎপাদন একবারে বন্ধ না করলে ঘি লোপ পাবে। এই অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত নয়। চল্লিশ বৎসর আগে হাইড্রোতেল ছিল না, তখন ঘিএ চর্বি চীনাবাদাম তেলের ভেজাল দেওয়া হত। ভাল চর্বির গন্ধ অনেকটা ভঁয়ষা ঘিএর মতন, তাই ভেজাল ধরা সাধারণের অসাধ্য ছিল। হাইড্রোতেল তুলে দিলে আবার চর্বি চলবে। ঘি-ব্যবসায়ীর যে অসুবিধা হয়েছে তার প্রকৃত কারণ হিন্দু জনসাধারণ চোখ বুজে চর্বি-মিশ্রিত ভেজাল ঘি খেলেও শুধু চর্বি খেতে রাজী নয়, কিন্তু শুধু হাইড্রোতেল খেতে তার আপত্তি নেই। সেকালে খাঁটী আর ভেজাল ঘিএর একাধিপত্য ছিল, তাই ঘিএর ব্যবসা ভাল চলত। কিন্তু এখন হাইড্রোতেল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। হাইড্রোতেল তুলে দিলে চর্বি-মিশ্রিত ভেজাল ঘিএর বিক্রি খুব বেড়ে যাবে, খাঁটী ঘিএর দাম চড়বে।

ভারতবর্ষ ভেজালের জন্য কুখ্যাত। আমাদের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসংখ্য অসাধু আছে, জনসাধারণও নিশ্চেষ্ট। বাজারের ঘি আর তেলে প্রচুর ভেজাল চলে, বিদেশ থেকে ঘি আর

সরষের তেলের কৃত্রিম এসেন্স অবাধে আমদানি হয়। আমাদের সরকার ছোটখাটো ভেজালদারদের সাজা দেন কিন্তু বড়দের পরিহার করেন। যেমন, বেরাল নেংটি ইঁদুর ধরে কিন্তু ড্রেনবাসী বড় ইঁদুর দেখলে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয়।

সরকারী নিয়ম অনুসারে হাইড্রোতেলে কিছু তিল তেল দেওয়া হয়। রাসায়নিক পরীক্ষায় তিল তেল সহজেই ধরা যায়, সেজন্য ঘিএ হাইড্রোতেল থাকলে তিল তেলের জন্যই ভেজাল ধরা পড়ে। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষা সাধারণের সাধ্য নয়, সেজন্য প্রস্তাব হয়েছে, হাইড্রোতেলে এমন রঙ দেওয়া হক যাতে ঘিএ মেশালে রঙ দেখেই লোকে ভেজাল বুঝতে পারে। এই প্রস্তাব একবারে নিরর্থক। হাইড্রোতেলে যদি প্রচুর রঙ থাকে তবেই ঘিএ তার ভেজাল ধরা পড়বে। কিন্তু লাল নীল সবুজ ব্রাউন ইত্যাদি রঙের হাইড্রোতেল তৈরি করা বৃথা, কেউ তা কিনবে না।

হাইড্রোতেলের দোষ

হাইড্রোতেলে প্রপূরিত গাঢ় স্নেহাম্ল বেশী, সেজন্য তার কতকটা হজম হয় না, মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এই কারণে খাদ্য হিসাবে তেলের চাইতে হাইড্রোতেল নিকৃষ্ট।

শারীরবিজ্ঞানী আর স্বাস্থ্যবিশারদগণ মাঝে মাঝে এমন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যাতে লোকে উদ্‌বিগ্ন হয়। কয়েক বৎসর থেকে তাঁরা প্রচার করছেন, সিগারেট-খোরদের মধ্যে ফুসফুসের

ক্যানসার বেশী দেখা যায়। সিগারেট-ব্যবসায়ীরা এই মত খণ্ডনের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন, নামজাদা ডাক্তারদের দিয়ে প্রতিবাদও প্রচার করাচ্ছেন, তথাপি সিগারেটের অনিষ্টকরতা এখন প্রায় সর্বস্বীকৃত হয়েছে। এই বিষয় নিয়ে সাধারণ লোকেও খুব জল্পনা করছে, কিন্তু সিগারেটের কাটতি এখন পর্যন্ত কিছুমাত্র কমে নি। লোকের মনোভাব বোধ হয় এই,—হুজুগে পড়ে নেশা ছাড়তে পারব না, ক্যানসার যখন হবে তখন দেখা যাবে। সম্প্রতি শারীরবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন, স্নেহদ্রব্যে যদি প্রপূরিত স্নেহাম্ল থাকে তবে তা বেশী খেলে রক্তে কোলেস্টেরল নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তার ফলে থ্রম্বোসিস হতে পারে। হাইড্রোতেলে প্রপূরিত স্নেহাম্ল বেশী, সেজন্য এসব জিনিস খেলে থ্রম্বোসিসের সম্ভাবনা বাড়ে। মাখন আর ঘিও নিরাপদ নয়, কারণ তাতেও প্রপূরিত স্নেহাম্ল আছে। অতএব তরল তেল খাওয়াই সব চেয়ে ভাল।

ঘিএর অনুকল্প

এদেশে যেমন ঘিএর, পাশ্চাত্ত্য দেশে তেমনি মাখনের আদর। মাখন দুর্মূল্য, সেজন্য দরিদ্রের জন্য মাখনের অনুকল্প মার্গারিন-এর প্রচলন হয়েছে। ঘিএরও একটা অনুকল্প দরকার। মার্গারিন দেখতে মাখনের মতন হলেও উপাদান মাখনের সমান নয়, কিন্তু সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আমাদের দেশে ঘিএর যে অনুকল্প হবে তারও উপাদান আর লক্ষণ নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার।

হাইড্রোতেলে প্রপূরিত স্নেহাম্ল যদি খুব কমানো হয়, অর্থাৎ চীনাবাদাম তেলে যদি বেশী হাইড্রোজেন সংযোগ নিষিদ্ধ হয় তবে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা কমবে। এ রকম হাইড্রোতেল হয়তো খুব নরম হবে, গ্রীষ্মকালে তেলের মতন তরল থাকবে, কিন্তু নিরাপত্তার জন্য তাই চালাতে হবে। সরকার স্বয়ং উদ্‌যোগী হয়ে কিছু করবেন মনে হয় না, কিন্তু জনমত যদি প্রবল হয়, তবে আইন করতে বাধ্য হবেন।

এক বিষয়ে চর্বি আর গাঢ় হাইড্রোতেল ঘি আর তরল তেলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বিস্কুটে ঘি বা তেলের ময়ান দিলে চলে না। পূর্বে দেশী বিলাতী সব বিস্কুটেই চর্বির ময়ান চলত, এখন হাইড্রোতেল দেওয়া হয়। রান্নার হাইড্রোতেল যদি পাতলা করা হয় বিস্কুটওয়ালাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

বাজারে প্রায় গন্ধহীন ও বর্ণহীন চীনাবাদাম তেল পাওয়া যায়, তার দাম সাধারণ তেলের চাইতে বেশী, কিন্তু হাইড্রোতেলের চাইতে কম। অনেক গুজরাটী আর মারোয়াড়ী খাবারওয়ালা তা ঘিএর বদলে ব্যবহার করে। এই deodorized decolorized তেলে হাইড্রোজেন যোগ করা হয় না, তেলের স্বাভাবিক স্নেহাম্লই বজায় থাকে। বাঙালী গৃহস্থ এই তেল ঘিএর অনুকল্পরূপে ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

১৮৮১

রাশি রাশি

শ্রীপ্রমথ বিশার কোনও বইএ পড়েছি, অক্ষয়কুমার দত্ত অহরহ ভাবতেন, ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড ! শেষ বয়সে তাঁর মাথার অসুখ হয়েছিল, নিরামিষ ছেড়ে তিনি আমিষ খেতে শুরু করেছিলেন। প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তাই বোধ হয় তাঁর অসুখের কারণ।

বিপুল, বিশাল, বিরাট, ভূমা, অসীম ইত্যাদি শব্দের একটা মোহিনী শক্তি আছে। অত্যন্ত বৃহতের চিন্তা আমাদের একটু অভিভূত করে, তার উপলব্ধিতে আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হই, আনন্দিত হই, কিঞ্চিৎ ভয়ও পাই। অদৃষ্টপূর্ব বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন 'হৃষিত' অর্থাৎ রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন, তাঁর মন 'ভয়ে প্রব্যথিত' হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বিপুলতা থেকে আশ্বাসও পান। ভবভূতি তাঁর জীবদ্দশায় অবজ্ঞাত ছিলেন। মালতীমাধব নাটকের প্রস্তাবনায় এই বলে তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন— কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা ; কোনও কালে কোনও দেশে এমন লোক থাকতে পারেন যিনি আমার সমানধর্মা এবং এই রচনার গুণগ্রহণে সমর্থ।

আকাশ সমুদ্র হিমালয় ইত্যাদির বিশালতা কবিকে ভাবাবিষ্ট করে। দেশ আর কাল নিয়ে দার্শনিকরা চিরকাল মাথা ঘামিয়েছেন, এই দুই বিরাট পদার্থের কি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে,

না শুধুই আমাদের অধ্যাস বা illusion? এখনও তাঁরা এ রহস্যের সমাধান খুঁজে পান নি। বিজ্ঞানীরা সমস্তই মাপতে চান, তাঁদের মানদণ্ড একদিকে বেড়ে চলেছে, আর একদিকে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম হচ্ছে, আগে যে সংখ্যা পর্যাপ্ত মনে হত এখন তাতে কুলয় না। সেকালেও লোকের ধারণা ছিল যে আকাশে অসংখ্য তারা আছে, কিন্তু শুধু চোখে যা দেখা যায় তার সংখ্যা তিন হাজারের বেশী নয়, লোকে তাই অসংখ্য মনে করত। এখন যন্ত্রের যত উৎকর্ষ হচ্ছে ততই বেশী তারা দেখা যাচ্ছে, লক্ষ থেকে কোটি, তার পর বহু কোটি।

এক শ বৎসর আগে পাশ্চাত্ত্য দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক বাইবেলের উক্তি অনুসারে বিশ্বাস করতেন যে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভূবিজ্ঞানী লায়েল বললেন, পৃথিবীর বয়স কয়েক হাজার নয়, কয়েক কোটি বৎসর। তার পর ডারউইন আর ওআলেস প্রচার করলেন, লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপী ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে পুরাতন জীব থেকে নব নব জীবের উদ্ভব হয়েছে। তখনকার গোঁড়া খ্রীষ্টানরা (মায় প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন) এই মতের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলেন, কিন্তু তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হলেন। আধুনিক গবেষণায় স্থির হয়েছে, পৃথিবীর বয়স কয়েক কোটি নয়, বহু কোটি বৎসর।

আমাদের শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের কালপরিমাণ আরও বিপুল। চতুর্যুগ = ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর। এক মন্বন্তর = ৩০

কোটি ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর। ব্রহ্মার এক অহোরাত্র= ২৮,৮০০ কোটি বৎসর। ব্রহ্মার আয়ু=১০,৩৬৮এর পর ১২ শূন্য দিলে যত হয় তত বৎসর।

প্রচলিত ধারাপাতে সংখ্যার এই তালিকা দেখা যায়।— এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত (million), কোটি, অর্বুদ, বৃন্দ, খর্ব, নিখর্ব, শঙ্খ (billion), পদ্ম, সাগর, অন্ত্য, মধ্য, পরার্ধ। বৃন্দ-এর অন্য নাম অব্জ। Prof. N. W. pirie, F. R. S. ১৯৫৪ সালে লিখিত Origin of Life প্রবন্ধে অব্জ শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

পরার্ধ মানে ১এর পিঠে ১৭ শূন্য। ছেলেবেলায় আমরা যে ধারাপাত পড়তুম তাতে পরার্ধের পরেও অনেক সংখ্যা ছিল। তাদের নাম ভুলে গেছি, শুধু শেষের দুটি মনে আছে— পার, অপার। আমাদের যিনি অঙ্ক শেখাতেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, অপারের পরে কোন্ সংখ্যা? তাঁর বিদ্যা বেশী ছিল না, উত্তর দিলেন, অপার সব চাইতে বড়, তার পরে আর সংখ্যা নেই। আমি বললুম, কেন, অপারের পিঠে তো আরও শূন্য জুড়ে দেওয়া যায়। তিনি বললেন, তাতে তোর লাভটা কি? অপারের বেশী টাকাও তোর হবে না, কাঁইবিচিও হবে না। মাস্টারমশাই রিয়ালিস্ট ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত পিঁপড়ের মতন। চিনির এক কণায় যদি পেট ভরে তবে বস্তার সন্ধান করা বোকামি।

বিজ্ঞানীরা টাকা গোনবার জন্যে সংখ্যা চান না, যেসব বৃহৎ

বা সূক্ষ্ম বা রাশি রাশি বস্তু নিয়ে তাঁদের কারবার, তার পরিমাপের জন্যেই সংখ্যা দরকার। লক্ষ, কোটি, মিলিয়ন, বিলিয়ন ইত্যাদিতে এখন কাজ চলে না। তারায় তারায় দূরত্ব মাপা হয় আলোকবর্ষ দিয়ে (প্রায় ৬এর পর ১২ শূন্য মাইল), অথবা parsec দিয়ে (প্রায় ১৯এর পর ১১ শূন্য মাইল), অতি সূক্ষ্ম বস্তু মাপা হয় Angstrom unit দিয়ে (১ সেন্টিমিটারের ১০ কোটি ভাগের ১ ভাগ)।

খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ দার্শনিক A. N. Whitehead লিখেছেন— Let us grant that the pursuit of mathematics is a divine madness of the human spirit, a refuge from the goading emergency of contingent happenings. অর্থাৎ ধরা যেতে পারে, গণিতের চর্চা একরকম দিব্যোন্মাদ, ঝঞ্ঝাট থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায়। হোআইটহেডের যদি ভারতীয় অলংকার শাস্ত্র পড়া থাকত তা হলে হয়তো লিখতেন— গণিতচর্চায় যে আনন্দ লাভ হয় তা ব্রহ্মাস্বাদসহোদর।

যাঁরা খাঁটী গাণিতিক তাঁরা সংখ্যা নির্ধারণ করেই খুশী, তা দিয়ে কি মাপা হবে সে চিন্তা তাঁদের নেই। Edward Kasner একজন বিখ্যাত মার্কিন গণিতজ্ঞ। খেয়ালের বশে একদিন তিনি একটা সংখ্যা স্থির করলেন— ১এর পিঠে ১০০ শূন্য। তাঁর ন বছরের ভাইপোকে বললেন, ওরে, এর একটা নাম বলতে পারিস? ভাইপো বলল, googol। নামটি গ্রীক

ল্যাটিন বা ইংরেজী নয়, ছোট ছেলের স্বচ্ছন্দ বালভাষিত, যেমন হিটুটিমাটিম। কিন্তু এই গুগল নাম এখন সর্বস্বীকৃত হয়েছে। কাসনার তাঁর ভাইপোকে আবার বললেন, গুগলের চাইতে ঢের বড় একটা সংখ্যা বলতে পারিস? ভাইপো বলল, পারি, একের পিঠে দেদার শূন্য বসিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না হাতে ব্যথা হয়। কাসনার বললেন, তা হলে তো একটা মূর্খ পালোয়ানের কাছে আইনস্টাইনকে হেরে যেতে হবে, সংখ্যার নির্ধারণ গায়ের জোরে হতে পারে না। তখন ভাইপো চিন্তা করে বলল, একের পিঠে এক গুগল শূন্য, এর নাম হক googolplex। কাসনার বললেন, তথাস্তু, গাণিতিক সমাজও তাই মেনে নিলেন।

আপনি অঙ্কপাত করে অনায়াসে এক গুগল অর্থাৎ ১এর পর ১০০ শূন্য লিখতে পারেন, লাইনটি লম্বায় চার-পাঁচ ইঞ্চের বেশী হবে না। কিন্তু গুগলপ্লেক্স লেখবার চেষ্টা করবেন না, পাগল হয়ে যাবেন। কাগজে কুলোবে না, ঘরেতেও নয়, পৃথিবীতেও নয়, আকাশের অতিদূরস্থ নক্ষত্র পর্যন্ত শূন্যের পর শূন্য বসিয়ে যেতে হবে।

গন্ধর্ব পুষ্পদন্ত যে মহিম্নস্তব রচনা করেছেন তার একটি শ্লোকে আছে— সমুদ্র যদি মসীপাত্র হয়, তাতে যদি অসিত-গিরিসম স্তূপীকৃত কজ্জল গোলা হয়, সুরতরুর শাখা যদি লেখনী হয়, ধরণী যদি পত্র হয় এবং শারদা যদি সর্বকাল লিখতে থাকেন, তথাপি হে মহেশ, তোমার গুণাবলীর পারে পৌঁছুতে পারবেন

না। পুষ্পদন্ত যদি আধুনিক গণিতের সংখ্যা জানতেন তা হলে সংক্ষেপে বলতে পারতেন, হে মহেশ তোমার গুণরাশি গুগলপ্লেক্সের চাইতেও বেশী।

সংখ্যাবিশারদরা অনেক রকম অদ্ভুত হিসাব করেছেন। মানবজাতি যখন প্রথম কথা বলতে শিখল তখন থেকে এখন পর্যন্ত মোট কত কথা বলেছে? শিশুর আধ-আধ কথা প্রেমালাপ গালাগালি রাজনীতিক বক্তৃতা ইত্যাদি সব নিয়ে ১এর পিঠে মোটে ১৬টা শূন্য, গুগলের চাইতে ঢের কম।

নোবেল-পুরস্কৃত এডিংটন হিসাব করেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত প্রোটন আছে তার সংখ্যা ১৩৬·২ × ১এর পর ২৫৬ শূন্য। ইলেকট্রনের সংখ্যাও তাই। অর্থাৎ গুগলের চাইতে বেশী কিন্তু গুগলপ্লেক্সের চাইতে কম।

আমাদের গ্যালাক্সি বা ছায়াপথে কত তারা আছে? জ্যোতিষীরা অনুমান করেন, ৩,০০০ কোটি থেকে ১০,০০০ কোটির মধ্যে, অর্থাৎ ৩এর পর ১০ শূন্য এবং ১এর পর ১১ শূন্যর মধ্যে। গুগলের চাইতে ঢের কম।

দাবা খেলায় যত চাল হতে পারে তার সংখ্যা কত? আগে ১এর পর ৫০ শূন্য বসান। যে সংখ্যা পাবেন তত শূন্য ১এর পর বসান। গুগলের চাইতে বেশী কিন্তু গুগলপ্লেক্সের চাইতে কম।

এইবার অতি ক্ষুদ্র রাশি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলে এই প্রবন্ধ শেষ করব। আমাদের শাস্ত্রোক্ত অণু-পরমাণু কি বস্তু তা

বোঝা যায় না। সংস্কৃত অভিধানে ত্রসরেণুর অর্থ— ছয় পরমাণুর সমষ্টি, অথবা গবাক্ষচ্ছিদ্রাগত রৌদ্রে দৃশ্যমান চঞ্চল সূক্ষ্ম পদার্থ। জীববিজ্ঞানে কীটের চাইতে কীটাণু ছোট, তার চাইতে জীবাণু বা মাইক্রোব ছোট, তার চাইতে ভাইরস ছোট (অণুবীক্ষণে অদৃশ্য)। রসায়নের অণু আরও ছোট, পরমাণু তার চাইতে ছোট, প্রোটন আরও ছোট, ইলেকট্রন সব চাইতে ছোট।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের উত্তম উদাহরণ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। মাদার টিংচারে যে মূল বস্তু থাকে তার ১০ ভাগের ১ ভাগ থাকে প্রথম ডাইলিউশনে। তৃতীয় ডাইলিউশনে ১,০০০ ভাগের ১ ভাগ। দ্বাদশ ডাইলিউশনে লক্ষ কোটি ভাগের ১ ভাগ। শততম ডাইলিউশনে থাকে : গুগলের ১ ভাগ। হোমিওপ্যাথরা বলেন, ডাইলিউশন বৃদ্ধিতে ঔষধের পোটেন্সি বৃদ্ধি হয়। অবিশ্বাসীরা বলেন, ১০০ ডাইলিউশনে পৌঁছুবার আগেই এমন অবস্থা হয় যে এক শিশিতে অণু-প্রমাণ ঔষধও থাকে না। বিশ্বাসী বলেন, তোমার অস্ত্রশাস্ত্র যাই বলুক, অণুপ্রমাণ ঔষধ থাকুক বা না থাকুক, স্পষ্ট দেখছি উপকার হয়, অতএব তর্ক না করে খেয়ে যাও, বিশ্বাসেই কৃষ্ণলাভ হয়।

অতি সূক্ষ্মের আর একটি উদাহরণ— ব্যাঙের আধুলির গল্প। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কঙ্কাবতীতে তার ভাল বর্ণনা আছে। ব্যাঙ তার বন্ধুকে একটি আধুলি ধার দিয়েছিল। শর্ত এই ছিল যে প্রতি কিস্তিতে অর্ধেক শোধ করতে হবে।

প্রথম কিস্তিতে চার আনা, দ্বিতীয়তে দু আনা, তার পর যথাক্রমে এক আনা, দু পয়সা, এক পয়সা, আধ পয়সা ইত্যাদি। ব্যাঙ হিসাব করে দেখল, তার পাওনা কোনও দিন শোধ হবে না, একটু বাকী থাকবেই। সে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল। ব্যাঙ যদি বুদ্ধিমান হত তবে বুঝত যে কয়েক কিস্তি পরেই বাকীর পরিমাণ নগণ্য হয়ে যাবে, অনন্তকাল তাকে অপেক্ষা করতে হবে না।

অন্তরকলন বা differential calculusএর আবিষ্কর্তা লিবনিৎস সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একদিন তিনি প্রশিয়ার রানীকে বললেন, যদি অনুমতি দেন তবে আজ আপনাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র infinitesimal রাশির রহস্য বুঝিয়ে দেব। রানী বললেন, আপনাকে বোঝাতে হবে না, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাকে বলে তা এখানকার এই সভাসদ্‌দের আচরণ থেকেই আমি টের পাই।

১৮৮১

ধর্মশিক্ষা

আমাদের দেশে সব রকম দুষ্কর্ম আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। চুরি ডাকাতি প্রতারণা ঘুষ ভেজাল ইত্যাদি দেশব্যাপী হয়েছে, অনেক রাজপুরুষ আর ধুরন্ধর ব্যবসায়ীর কর্মে অসাধুতা প্রকট হয়েছে, জননেতাদের আচরণেও অসংযম আর গুণ্ডামি দেখা দিয়েছে, ছেলেরা উচ্ছৃঙ্খল দুর্বিনীত হয়েছে। অনেক সরকারী অফিসে কাজ আদায়ের জন্যে চিরকালই আমলাদের ঘুষ দিতে হত। এখন তাদের জুলুম বেড়ে গেছে, উপর-ওয়ালাদের বললেও কিছু হয় না, তাঁরা নিম্নতনদের শাসন করতে ভয় পান।

প্রাচীন ভারতে চোরের হাত কেটে ফেলা হত। বিলাতে দেড় শ বৎসর আগে সামান্য চুরির জন্যেও ফাঁসি হত। রাজা রতন রাও কুলনারীহরণের জন্যে নিজের পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। এই রকম কঠোর শাস্তির ভয়ে দুর্বৃত্তরা কতকটা সংযত থাকত, কিন্তু একবারে নিরস্ত হত না।

সমাজরক্ষার জন্যে যথোচিত দণ্ডবিধি অবশ্যই চাই, কিন্তু তার চাইতেও চাই এমন শিক্ষা আর পরিবেশ যাতে দুষ্কর্মে প্রবৃত্তি না হয়। অনেকে বলেন, বাল্যকাল থেকে ধর্মশিক্ষাই দুষ্প্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। রিলিজস এডুকেশনের জন্যে বিলাতে আইন আছে, সকল খ্রীষ্টান ছাত্রকেই বাইবেল পড়তে

হয় এবং তৎসম্মত ধর্মোপদেশ শুনতে হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান মাত্রেই এই শিক্ষা অত্যাবশ্যক মনে করেন। কিন্তু যুক্তিবাদী র‍্যাশনালিস্টরা (যাঁদের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা মনীষী আছেন) বলেন খ্রীষ্টীয় বা অন্য কোনও ধর্মের ভিত্তিতে মরালিটি বা সামাজিক কর্তব্য শেখানো শুধু অনাবশ্যক নয়, ক্ষতিকরও বটে, তাতে বুদ্ধি সংকীর্ণ হয়।

বাল্যকাল থেকে সুনীতি আর সদাচার শিক্ষা অবশ্য কর্তব্য, এ সম্বন্ধে মতভেদ নেই। কিন্তু সেকিউলার বা লোকায়ত ভারতরাষ্ট্রের প্রজার জন্যে এই শিক্ষার ভিত্তি কি হবে? শিক্ষার্থীর সম্প্রদায় অনুসারে হিন্দু জৈন শিখ মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্র, অথবা শাস্ত্রনিরপেক্ষ শুধুই নীতিবাক্য?

রিলিজন শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ নেই। ক্রীড বা নির্দিষ্ট বিষয়ে আস্থা না থাকলে রিলিজন হয় না। হিন্দুধর্ম ঠিক রিলিজন নয়, কারণ তার বাঁধা ধরা ক্রীড নেই। কিন্তু যেমন মুসলমান আর খ্রীষ্টীয় ধর্ম, তেমনি জৈন শিখ বৈষ্ণব আর ব্রাহ্ম ধর্মও রিলিজন। ভারতীয় ছাত্র যদি মুসলমান খ্রীষ্টান জৈন শিখ বৈষ্ণব ব্রাহ্ম ইত্যাদি হয় তবে তার সাম্প্রদায়িক ক্রীড অনুসারে তাকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ হিন্দু ছাত্রকে কিংবা মিশ্র সম্প্রদায়ের বিদ্যালয়ে কি শেখানো হবে? শুধু অল্পবয়স্কদের জন্যে ব্যবস্থা করলে চলবে না, প্রাপ্তবয়স্করাও যাতে কুকর্মপ্রবণ না হয় তার উপায় ভাবতে হবে।

ধর্ম শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ অতি ব্যাপক— যা প্রজাগণকে ধারণ

করে। অর্থাৎ সমাজহিতকর বিধিসমূহই ধর্ম, যাতে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয় তাই ধর্ম। ইংরেজীতে gentleman এর একটি বিশিষ্ট অর্থ— chivalrous wellbred man। জেণ্টলম্যান বা সজ্জনের যে লক্ষণাবলী, তা যদি বহুগুণ প্রসারিত করা হয় তবে তাকে ধর্ম বলা যেতে পারে। শুধু ভদ্র বেশ, ভদ্র আচরণ, মার্জিত আলাপ, সত্যপালন, দুর্বলকে রক্ষা করা ইত্যাদি ধর্ম নয়, শুধু ভক্তি বা পরমার্থতত্ত্বের চর্চাও ধর্ম নয়। স্বাস্থ্য বল বিদ্যা উপার্জন সদাচার সুনীতি বিনয় (discipline) ইন্দ্রিয়সংযম আত্মরক্ষা দেশরক্ষা পরোপকার প্রভৃতিও ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে যে গুণাবলীর অনুশীলন ও সামঞ্জস্য বিবৃত করেছেন তাই ধর্ম। মানুষের সাধনীয় ধর্মের এমন সর্বাঙ্গীণ আলোচনা আর কেউ বোধ হয় করেন নি।

ভারতীয় বিদ্যার্থী সেকালে গুরুগৃহে যে শিক্ষা পেত তাকে তখনকার হিসাবে সর্বাঙ্গীণ বলা যেতে পারে। বিবিধ বিদ্যা আর শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান বা ritualএর সঙ্গে সদাচার আর সামাজিক কর্তব্যও শিক্ষণীয় ছিল। এখন গুরুগৃহের স্থানে স্কুলকলেজ হয়েছে, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তায় আস্থা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। এখনকার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা অত্যল্প, ধর্ম বা সামাজিক কর্তব্য শেখাবার তাঁদের সময় নেই, যোগ্যতাও নেই।

ধর্মশিক্ষার জন্যে কেউ কেউ মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করে

থাকেন। ছেলেরা নিয়মিত গায়ত্রী জপ, সন্ধ্যা-আহ্নিক, স্তোত্র-পাঠ, গীতা-অধ্যয়ন ইত্যাদি করুক। মেয়েরা মহাকালী পাঠশালার অনুকরণে নানা রকম ব্রতপালন আর শিবপূজা করুক। ছাত্র-ছাত্রীদের রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি শোনাবার ব্যবস্থা হক। সর্বশক্তিমান পরমকারুণিক ঈশ্বরে বিশ্বাস আর ভক্তি যাতে হয় তার চেষ্টা করা হক।

পাশ্চাত্ত্য দেশেও দুষ্ক্রিয়া বেড়ে গেছে। অনেকে বলেন, স্বর্গ-নরকে সাধারণের আস্থা কমে যাওয়াই নৈতিক অবনতির কারণ। Pie in the sky আর hell fire, অর্থাৎ পরলোকে গিয়ে পুণ্যবান স্বর্গীয় পিষ্টক খাবে আর পাপী নরকাগ্নিতে দগ্ধ হবে, এই বিশ্বাস লোপ পাচ্ছে। কলকাতার রাস্তায় খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞাপন দেখা যায়— Jesus Christ can save to the uttermost! ফ্রেমে বাঁধানো অনুরূপ আশ্বাসবাক্য দেশী ছবির দোকানে পাওয়া যায়— 'একমাত্র হরিনামে যত পাপ তরে, পাপিষ্ঠের সাধ্য নাই তত পাপ করে।' কিন্তু এই সব বাণীতে কোনও ফল হয় না, কারণ জনসাধারণ ইহসর্বস্ব হয়ে পড়েছে।

দুষ্ক্রিয়া বৃদ্ধির নানা কারণ থাকতে পারে। বোধ হয় একটি প্রধান কারণ, জুয়াড়ী প্রবৃত্তি বা gambling spiritএর প্রসার। লোকে দেখছে, দুষ্কর্মাদের অনেকেই ধরা পড়ে না, যারা ধরা পড়ে তাদেরও অনেকে শাস্তি পায় না। অতএব দুষ্কর্ম করে নিরাপদে লাভবান হবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। এক

শ জন দুষ্কর্মার মধ্যে যদি পঁচাত্তর জন সাজা না পায় তবে সেই পঁচাত্তরের মধ্যে আমারও স্থান হতে পারে, অতএব আইনের ভয়ে পিছিয়ে থাকব কেন? ঝুঁকি না নিলে কোনও ব্যবসাতে লাভ হয় না, দুষ্ক্রিয়াও একটা বড় ব্যবসা। লোকনিন্দা গ্রাহ্য করবার দরকার নেই, আমি যদি ধনবান হই তবে আমার দুষ্কর্ম জানলেও লোকে আমাকে খাতির করবে।

বহুকালের সংস্কার সহজে মুছে যায় না, স্বর্গ নরকে বিশ্বাস কমে গেলেও পাপের জন্যে একটা প্রচ্ছন্ন অস্বস্তিবোধ অনেকের আছে এবং তা থেকে মুক্তি পাবার আশায় তারা সুসাধ্য উপায় খোঁজে। বিস্তর লোক মনে করে, গঙ্গাস্নান, একাদশী পালন, দেববিগ্রহ দর্শন, গো-ব্রাহ্মণের কিঞ্চিৎ সেবা, মাঝে মাঝে তীর্থ-ভ্রমণ ইত্যাদি কর্মেই পাপস্খালন হয়। হরিনাম-কীর্তনে বা খ্রীষ্ট-শরণে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এই উক্তির সঙ্গে উহ্য আছে—আগে অনুতপ্ত হয়ে পাপকর্ম ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু লোকে কুকর্মের অভ্যাস ছাড়তে পারে না, মনে করে ভগবানের নাম নিলেই নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্ত পাপ ক্ষয় হবে। লোভী ডায়াবিটিক যেমন মিষ্টান্ন খায় আর ইনসুলিন নেয়।

আইনের ফেসাদে পড়লে লোকে যেমন উকিল মোক্তার বাহাল করে, তেমনি অনেকে পাপস্খালনের জন্যে গুরুর শরণ নেয়। সেকেলে মন্ত্রদাতা গুরুর প্রতিপত্তি এখন কমে গেছে, আধুনিক জনপ্রিয় সাধু-মহাত্মারা গুরুর স্থান নিয়েছেন। তাঁরা একসঙ্গে বিপুল ভক্তজনতাকে উপদেশ দেন, যেমন গৌতম বুদ্ধ

দিতেন এবং একালের রাজনীতিক নেতারা দেন। অনেকে মনে করে, আমার মাথা ঘামাবার দরকার কি, গুরুকে যদি ভক্তি করি আর ঘন ঘন তাঁর কাছে যাই তা হলে তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন। আমাদের দেশে সাধুসন্তের আবির্ভাব চিরদিনই হয়েছে, জনসাধারণের কাছে তাঁরা ভক্তি-শ্রদ্ধাও প্রচুর পেয়েছেন। কিন্তু এখনকার জনপ্রিয় গুরু-গুর্বীর সন্নিধানে যে বিপুল ভক্ত-সমাগম হয় তা বোধ হয় বুদ্ধ আর চৈতন্যদেবের কালেও দেখা যায় নি। শ্রীরামকৃষ্ণ আর শ্রীঅরবিন্দেরও এমন ভক্তভাগ্য হয় নি।

একদিকে গুরুভক্তির তুমুল অভিব্যক্তি, অন্যদিকে দুষ্কর্মের দেশব্যাপী প্লাবন, এই দুইএর মধ্যে কার্যকারণসম্বন্ধ আছে কি? একথা বলা যায় না যে গুরুভক্তি বেড়ে যাওয়ার ফলেই দুষ্কর্মের প্রবৃত্তি বেড়ে গেছে, কিংবা গুরুরা জাল ফেলে চুনো পুঁটি রুই কাতলা ভক্ত সংগ্রহ করছেন। সাধুসঙ্গকামী ধার্মিক সজ্জন এখনও অনেক আছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন হতে পারে যে দুষ্কর্ম বৃদ্ধির ফলেই সাধু মহাত্মা গুরুর চাহিদা বেড়ে গেছে, বিনা আয়াসে পাপমুক্ত হবার মতলবে এখন অসংখ্য লোক গুরুর দ্বারস্থ হচ্ছে।

ভক্ত অথচ লম্পট মাতাল চোর ঘুষখোর ইত্যাদি দুশ্চরিত্র লোক অনেক আছে। তথাপি দেখা যায়, যারা স্বভাবত ভক্তিমান তারা প্রায় শান্ত সচ্চরিত্র হয়। কিন্তু স্বাভাবিক যোগ্যতা না থাকলে কোনও লোককে যেমন গণিতজ্ঞ বা

সংগীতজ্ঞ করা যায় না, তেমনি কৃত্রিম উপায়ে অপাত্রকে ভক্তিমান করা যায় না। মামুলী নৈষ্ঠিক ক্রিয়াকর্ম করলে বা স্তোত্র আবৃত্তি করলে চিত্তের পরিবর্তন হবার সম্ভাবনা অতি অল্প। পুরোহিত মন্ত্র পড়ান— অপবিত্র বা পবিত্র যে-কোনও অবস্থায় যদি পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করা হয় তবে বাহ্য আর অভ্যন্তর শুচি হয়ে যায়। কেবল নাম স্মরণেই যদি দেহশুদ্ধি আর চিত্তশুদ্ধি হত তবে লোকে অতি সহজে দিব্যজীবন লাভ করত। গোঁড়া আচারনিষ্ঠ স্ত্রীপুরুষও কত মন্দ হতে পারে তার অনেক চিত্র শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পাওয়া যায়।

যে স্বভাবত সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান আর জিজ্ঞাসু, সে নিজের রুচি অনুসারে ভক্তি কর্ম বা জ্ঞানের চর্চা করে। শুনেছি বিদ্যাসাগর প্রায় নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু তাঁর মতন কর্মবীর পরোপকারী সমাজহিতৈষী অল্পই জন্মেছেন। গান্ধীজী ভক্ত বিশ্বাসী, নেহরুজী অভক্ত যুক্তিবাদী, কিন্তু দুজনেই অক্লান্তকর্মা লোকহিতৈষী সাধুপুরুষ।

মনুর বচন বলে খ্যাত একটি প্রাচীন শ্লোক আছে—

পরস্পরভয়াৎ কেচিৎ পাপাঃ পাপং ন কুর্বতে।
রাজদণ্ডভয়াৎ কেচিৎ যমদণ্ডভয়াৎ পরে॥
সর্বেষামপি চৈতেষামাত্মা যময়তাং যমঃ।
আত্মা সংযমিতো যেন যমস্তস্য করোতি কিম্॥

—কোনও কোনও পাপমতি পরস্পরের ভয়ে পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে, কেউ রাজদণ্ডের ভয়ে, কেউ বা যমদণ্ডের ভয়ে।

কিন্তু সকল শাসকের উপরে শাসন করে আত্মা বা অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ যে সংযমিত করেছে যম তার কি করবে ?

মোট কথা, ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য অন্তকরণের সংযমন বা বিনয়ন, disciplining the mind। এই বিনয়নের উপায় অন্বেষণ করতে হবে।

শোনা যায় কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা অবিনীত লোককে বিনীত করা হয়। প্রথমে হয় brain washing বা মস্তিষ্ক ধোলাই, অর্থাৎ লোকটির মনে যেসব কমিউনিস্ট-নীতিবিরুদ্ধ পূর্ব সংস্কার আছে তার উচ্ছেদ করা হয়, তার পর অবিরাম মন্ত্রণা দিয়ে এবং দরকার মতন পীড়ন করে নূতন সংস্কার বদ্ধমূল করা হয়। এই indoctrination এর ফলে বহু নবাগত বিদেশী পূর্বের ধারণা ত্যাগ করে কমিউনিস্ট শাসনের আজ্ঞাবহ ভক্ত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের প্রজাদের শিশুকাল থেকেই শেখানো হয় — পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলের স্বার্থের চাইতে রাষ্ট্রের স্বার্থ বড়, রাষ্ট্রশাসকের বিধান শিরোধার্য করাই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম, অন্য দেশে যে ডিমোক্রেসি আছে তা দুর্নীতিপূর্ণ ধাপ্পাবাজি মাত্র, প্রকৃত গণতন্ত্র কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেই আছে, সেখানকার প্রজাই প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করে। অবশ্য এমন লোক অনেক আছে যারা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রজা না হয়েও স্বেচ্ছাক্রমে সেখানকার শাসনতন্ত্রের বশংবদ ভক্ত এবং তার কোনও দোষই মানতে চায় না।

এই রাষ্ট্রবিহিত একদেশদর্শী শিক্ষার ফলে কমিউনিস্ট প্রজার মানসিক পরিণতি কি হয়েছে তার আলোচনা অনাবশ্যক, অনেকে সে সম্বন্ধে বলেছেন। কিন্তু যেসব পর্যটক অপক্ষপাতে দেখেছেন তাঁরা কমিউনিস্ট শাসনের শুধু দোষ আবিষ্কার করেন নি, অনেক সুফলও লক্ষ্য করেছেন। সম্প্রতি (২৪-১০-৫৯) স্টেট্সম্যান পত্রে প্রকাশিত একজন নিরপেক্ষ দর্শকের বিবরণ থেকে কিছু তুলে দিচ্ছি—

China today is free of all signs of jobbery and corruption, and this is no mean achievement. ...One does feel that we, in our country, could do with a little more honesty. There is an air of efficiency everywhere in the new China. ···One does not have to worry about things like the purity of food,...or short measure or incorrect prices. These things are the result of strict controls. I miss these on my return to India. ···The people have been made conscious of the need to keep their homes and the streets clean. ···Is it fear that drives him or is it patriotism ? The truth probably is, a bit of both. ···The Communist party has...used two methods : coercion and "education".

ডিক্‌টেটর-শাসিত রাষ্ট্রে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম সম্পাদিত হয়, সেখানকার প্রজা ভয়ে বা ভক্তিতে নিয়মনিষ্ঠ হয়ে চলে। গণতন্ত্রে ততটা আশা করা যায় না, কারণ, দুষ্ট দমনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সেখানকার শাসকদের নেই। যারা দুষ্ট আর দুষ্টের পোষক, তাদেরও ভোট আছে, সুতরাং তারা অসহায় নয়। গণতন্ত্রের আদর্শ— প্রজার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বেশী হস্তক্ষেপ না করে এমন শিক্ষা, পরিবেশ আর দণ্ডবিধির প্রবর্তন যাতে লোকে সুবিনীত কর্তব্যনিষ্ঠ হয়। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অনুকরণ না করেও সেখান থেকে আমরা কিছু শিখতে পারি।

Indoctrinationএর একটি ভাল প্রতিশব্দ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর কাছ থেকে পেয়েছি— কর্ণেজপন, চলিত কথায় যার নাম জপানো বা ভজানো। শব্দটি মন্দ অর্থেই চলে, কিন্তু ভাল মন্দ মাঝারি সকল উদ্দেশ্যেই এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ হতে পারে। শিশুকে যখন শেখানো হয়— সত্য কথা বলবে, চুরি করবে না, ঝগড়া মারামারি করবে না, গুরুজনের কথা শুনবে ইত্যাদি, তখন শিশুর মঙ্গলের জন্যেই তার কর্ণেজপন হয়। ভোটের দালালরা যখন নিরন্তর গর্জন করে— অমুককে ভোট দিন ভোট দিন, তখন পাড়ার লোকের কর্ণেজপন হয়। ধর্মঘটী আর রাজনীতিক শোভাযাত্রীর দল অবিরাম যে স্লোগান আওড়ায় তা সর্বসাধারণের কর্ণেজপন। কিন্তু এই ধরনের স্থূল ঘোষণায় বিশেষ কিছু ফল হয় না, কর্ণেজপন হলেও তা প্রায় অরণ্যে রোদনের তুল্য।

ব্যবসায়ী যে বিজ্ঞাপন প্রচার করে তাও কর্ণেজপন। অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনে সত্য মিথ্যা আর অত্যুক্তির এমন নিপুণ মিশ্রণ থাকে যে বহু লোক মোহগ্রস্ত হয়। 'তেল ঘি খেয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট করবেন না, অমুক বনস্পতি খান, পুষ্টির জন্যে তা অপরিহার্য, আধুনিক সভ্য আর শিক্ষিত জনের রান্নাঘরে তা ছাড়া অন্য কিছু ঢুকতে পায় না।' সম্প্রতি লোকসভায় একজন মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে এরকম বিজ্ঞাপন আপত্তি-জনক, কিন্তু এমন আইন নেই যাতে এই অপপ্রচার বন্ধ করা যায়।

বিনা টিকিটে রেলে ভ্রমণ, অকারণে শিকল টেনে গাড়ি থামানো, রেলকর্মচারীকে নির্যাতন, গাড়ির আসবাব চুরি ইত্যাদি নিবারণের জন্যে সরকার বিস্তর বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশবাসীকে আবেদন জানাচ্ছেন, কিন্তু কোনও ফল হচ্ছে না, কারণ, কুকর্ম নিবারণে শুধু কর্ণেজপন যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে শাস্তির অবশ্যম্ভাবিতা আর লোকমতের প্রবল সমর্থন আবশ্যক। ভেজাল ধরা পড়লে যে শাস্তি হয় তা অতি তুচ্ছ। অপরাধী ধনী হলে তার নাম প্রায় প্রকাশিত হয় না। একই লোক তেল-ঘিএ ভেজালের জন্যে বহুবার জরিমানা দিয়েছে এবং স্বচ্ছন্দে সসম্মানে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে এমন উদাহরণ বিরল নয়।

বিষ্ণুশর্মা বলেছেন, নব মৃৎপাত্রে যে সংস্কার লগ্ন হয় তার অন্যথা হয় না। বাল্যশিক্ষার অর্থ, লেখাপড়া শেখাবার সঙ্গে

সঙ্গে বিবিধ হিতকর সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ করা। এর প্রকৃষ্ট উপায় নির্ধারণের জন্যে বিচক্ষণ মনোবিজ্ঞানীদের মত নেওয়া আবশ্যক। শিক্ষার সবটাই বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, চরিত্র-গঠনে অভিভাবন বা snggestionএরও স্থান আছে। যে শিক্ষক ধর্মশিক্ষা বা নীতিশিক্ষা দেবেন তাঁকে শিক্ষণের পদ্ধতি শিখতে হবে। কিন্তু বাল্যশিক্ষাই যথেষ্ট নয়, বয়স্থ জনসাধারণ যাতে সংযমিত থাকে তার জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা দরকার। শুধু উপদেশে বা সরকারী বিজ্ঞাপনে কাজ হবে না. বর্তমান দণ্ডনিতী কঠোরতর করতে হবে এবং সেইসঙ্গে প্রবল জনমত গঠন করতে হবে।

সৎকর্ম আর সচ্চরিত্রতার শ্রেষ্ঠ উদ্দীপক জনসাধারণের প্রশংসা, দুষ্কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক জনসাধারণের ধিক্‌কার। ট্রামকর্মী, মোটর-বস ও ট্যাক্সির চালক, মুটে ইত্যাদির সাধুতা, বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের সাহসিকতা ইত্যাদি বিবরণ মাঝে মাঝে কাগজে দেখা যায়। এইসব কর্মের প্রশংসা আরও ব্যাপক-ভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত। সাধারণের কাছে সিনেমাতারকা, ফুটবল-ক্রিকেট-খেলোয়াড়, সাঁতারু ইত্যাদির যে মর্যাদা, সৎকর্মা আর সাহসী স্ত্রীপুরুষেরও যাতে অন্তত সেই রকম মর্যাদা হয় তার চেষ্টা করা উচিত। দুষ্কর্মের নিন্দা তীক্ষ্ণ ভাষায় নিরন্তর প্রচার করতে হবে, যাতে জনসাধারণের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। শুধু মামুলী দুষ্কর্ম নয়, রাস্তায় ময়লা ফেলা, যেখানে সেখানে প্রস্রাব করা, পানের পিক ফেলা, রাস্তার কল খুলে

রেখে জল নষ্ট করা, নিষিদ্ধ আতসবাজি পোড়ানো ইত্যাদি নানা রকম কদাচারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন দরকার। সংবাদপত্রের কর্তারা যদি বিবিধ রাজনীতিক সভার বিবরণ, সিনেমা চিত্রের বিস্তারিত পরিচয়, রাশিফলের আলোচনা ইত্যাদি কমিয়ে দিয়ে সৎকর্মের প্রশংসা আর কুকর্মের নিন্দা বহুপ্রচারিত করেন তবে তা সার্থক কর্ণেজপন হবে, লোকমতও প্রভাবিত হবে। যেমন দেশব্যাপী খাদ্যাভাব, তেমনই দেশব্যাপী দুর্নীতি, কোনটাই উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক নেতাদেরও এই জনমত গঠনে উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য।

সাধারণের পক্ষে ফ্যাশনের বিধান প্রায় অলঙ্ঘনীয়। যে নিষ্ঠার সঙ্গে স্ত্রীপুরুষ ফ্যাশনের বিধি-নিষেধ মেনে চলে, সেই রকম নিষ্ঠা বিহিত-অবিহিত কর্ম সম্বন্ধেও যাতে লোকের মনে দৃঢ়বদ্ধ হয় তার জন্যে সুকল্পিত ব্যাপক আর অবিরাম প্রচার আবশ্যক।

পঞ্চশীল ভঙ্গ করে চীন দুঃশীল হয়েছে, ক্রূর কর্ম করে ভারতবাসীকে ক্ষুব্ধ বিদ্বিষ্ট করেছে। চীনের শাসনতন্ত্রে যতই স্বেচ্ছাচার নির্দয়তা আর কুটিলতা থাকুক, প্রজার স্বাধীন চিন্তা যতই দমিত হক, সে দেশের জনসাধারণের যে নৈতিক উন্নতি হয়েছে তা অগ্রাহ্য করা যায় না। কিছুকাল আগেও দুর্নীতির জন্যে চীন কুখ্যাত ছিল, কিন্তু দশ বছরে ভাল-মন্দ যে উপায়েই হক, চীনের প্রজা সংযমিত কর্তব্যনিষ্ঠ হয়েছে, আর আমাদের

দেশে তার বিপরীত অবস্থা দেখা দিয়েছে। কোনও অবতার বা মহাপুরুষ অলৌকিক শক্তির দ্বারা আমাদের উদ্ধার করতে পারবেন না। কমিউনিস্ট পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ না করেও আমরা সমবেত চেষ্টায় দেশের কলঙ্ক মোচন করতে পারি। যদি হাল ছেড়ে দিয়ে যদ্‌ভবিষ্য নীতি আশ্রয় করি তবে আমাদের রক্ষা নেই।

১৮৮২

রবীন্দ্র-জন্মদিন

কোনও মহাপুরুষের উদ্দেশে লোকে যখন সমবেতভাবে শ্রদ্ধার অর্ঘ দেয় তখন এক বা একাধিক প্রতীক উপলক্ষ্য করেই তা দিয়ে থাকে। এই প্রতীক প্রতিমূর্তি হতে পারে, কৃতির নিদর্শন হতে পারে, জন্মস্থান সাধনাস্থান বা জন্মদিনও হতে পারে। যদি অসংখ্য অনুরাগী জন একই কালে বা একই স্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তবে সেই শ্রদ্ধা বিপুলতা পায়।

পঁচিশে বৈশাখে অনেক লোক জন্মেছে, কিন্তু একাধিক রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় নি। অতএব এই তারিখের কোনও নিজস্ব নিরপেক্ষ মহত্ত্ব নেই। ফলিত জ্যোতিষে যাঁদের আস্থা আছে তাঁরা হয়তো বলবেন, শুধু দিন ক্ষণ তিথি নক্ষত্র নয়, আরও অনেক রকম জটিল যোগাযোগ চাই, তবেই রবীন্দ্রনাথের তুল্য পুরুষের উদ্‌ভব হতে পারে। যাঁরা কার্যকারণের অনন্ত শৃঙ্খলা মানেন তাঁরা বলবেন, শুধু জ্যোতিষিক সমাবেশ নয়, অসংখ্য কারণপরম্পরার ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের উদ্‌ভব হয়েছিল, কিন্তু তার নির্ণয় আমাদের অসাধ্য।

তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য দেবতার অধিষ্ঠানের জন্যে নয়, বহু কাল যাবৎ অগণিত ভক্তের সমাগমের ফলে সামান্য স্থানও পুণ্যভূমি হয়ে ওঠে। চৈত্র-শুক্ল-নবমী, ভাদ্র-কৃষ্ণ-অষ্টমী, ক্রিসমাস ডে প্রভৃতির পুণ্যতা রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বা যিশুখ্রীষ্টের

জন্মের জন্যে নয়, অসংখ্য ভক্ত একই দিনে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, সেই কারণেই তা পুণ্যদিন। পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম একটি আকস্মিক ঘটনা। তিনি যদি সামান্য লোক হতেন তবে এই দিন কেউ গ্রাহ্য করত না। তিনি অসামান্য, তাই এই দিনকে উপলক্ষ্য করে গুণগ্রাহী ভক্তজন সমবেতভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, এবং তার ফলেই এই দিনটি পুণ্যময় পর্বদিনে পরিণত হয়েছে।

বুদ্ধ খ্রীষ্ট চৈতন্যদেব প্রভৃতির যে বিবরণ সমকালীন লোকেরা রেখে গেছেন তার কতটা ইতিবৃত্ত আর কতটা পৌরাণিক বা mythical তার নির্ণয় সহজ নয়। ধর্মনেতা বা অবতারদের চরিতকথায় কালক্রমে অতিরঞ্জন এসে পড়ে। ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ ধর্মনেতা ছিলেন না এবং তিনি স্বয়ং স্মৃতিকথা লিখে গেছেন। যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁদেরও অনেকে কবির কথা লিখেছেন। যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা এখনও লিখছেন। পঞ্চাশ ষাট সত্তর বৎসর পরে এই সাক্ষাৎদর্শীদের কেউ জীবিত থাকবেন না, তখন তাঁদের লিখিত বিবরণ আর কবির স্বরচিত আত্মকথাই আমাদের ঐতিহাসিক সম্বল হবে।

স্মরণ কীর্তন আর আলোচনাই শ্রদ্ধাপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়। তার ভিত্তি বিশ্বস্ত সত্যাশ্রিত বিবরণ। যাঁরা কবির কথা লিখছেন, ভবিষ্যদ্‌-বংশীয়দের কাছে তাঁদের গুরুতর দায়িত্ব আছে। লেখক আর সমালোচকদের সতর্ক থাকতে হবে যেন

রবীন্দ্রচরিতকথায় কল্পনা আর জল্পনা না আসে, যেন তা কিংবদন্তী বা অবদানকল্পলতায় পরিণত না হয়।

১৮৮১

বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের নবনবতিতম জন্মোৎসবে পঠিত।

পরিশিষ্ট

সাহিত্য-সংস্কার এবং তামাক ও বড় তামাক এই দুটি প্রবন্ধ ১৮৪৯ শকাব্দে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ দুটি এ পর্যন্ত কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায়, এই অংশে সংযোজিত হইল।

সব দিকে শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে। হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ মিটিয়াছে, মিস মেয়ো অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন, স্টেট্‌স্‌ম্যান বর্জন ও ইংলিশম্যানের অর্জন জোরে চলিতেছে, রিফর্ম কমিশনও নিশ্চয় বয়কট হইবে। কিন্তু আসল কাজই বাকী রহিয়াছে,— খুড়ার গঙ্গাযাত্রা।

সজ্ঞানে তীরস্থ করার উপযোগী খুড়া পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু বিস্তর লেখক আছেন, ছোট বড় মাঝারি,— তাঁদের দুরস্ত করাই এখন মস্ত কাজ। লেখকগণের নিজের চরিত্র সংশোধনের কথা বলিতেছি না। কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার চরিত্র, তারা কি বলে কি করে, তাহা উপেক্ষার বিষয় নয়।

গীতায় ভগবান একটি খাঁটী কথা বলিয়া গেছেন— কিং কর্ম কিং অকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ— অর্থাৎ, কি কর্ম আর কি অকর্ম সে বিষয়ে কবিদের কাণ্ডজ্ঞান নাই। এই কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে যে সব অনর্থ ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে তার প্রতিকার আবশ্যক। আমাদের প্রথম কর্তব্য— বড় বড় লেখকগণ যা লিখিয়া ফেলিয়াছেন তার একটা গতি করা। দ্বিতীয় কর্তব্য— ভবিষ্যতে যাঁরা লিখিবেন তাঁদের জন্য একটা আদর্শ-নির্দেশ।

ছোট-খাটো লেখকগণ ধর্তব্য নন, কারণ তাঁদের লেখা কালক্রমে আপনিই মুছিয়া যাইবে। কিন্তু যাঁরা সম্রাট, তাঁদের লেখা আবশ্যক মত সংস্কার করা অবশ্য কর্তব্য। শুনিয়াছি রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা দূরে থাক তাঁর গানের সুরেও কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিতে চান না। যদি সত্য হয় তবে দুঃখের বিষয়। স্টিফেনশন প্রথমে যে রেলগাড়ির এঞ্জিন সৃষ্টি করেন তার চিম্‌নি ছিল চার হাত, হেলিয়া দুলিয়া কোনও গতিকে গজেন্দ্রগমনে ঘণ্টায় পাঁচ-দশ মাইল চলিত। আর এখনকার পঞ্জাব বম্বে মেলের এঞ্জিন দেখ, কি পরিবর্তন। কিন্তু স্টিফেনশনের মর্যাদা কিছুই কমে নাই। যদি রবীন্দ্রনাথের বাউলের সুর ওস্তাদ-পরম্পরায় সংস্কৃত হইয়া বাগেশ্রী-চৌতালে পরিণত হয়, তবে তাঁর ক্ষুণ্ণ হওয়া অনুচিত, কারণ ক্রমোন্নতিই জগতের নিয়ম। যদি কোন দক্ষ ব্যক্তি গোরার উন্নত সংস্করণে পরেশ বাবুর বড় মেয়ে লাবণ্যর সঙ্গে পানুবাবুর বিবাহ দেয়, তবে দেখিতে শুনিতে ভালই হয়। অধিকন্তু, যদি রেল-লাইনের উপরেই শানাই বাজাইয়া মোটর চালানো যায়, অর্থাৎ নরেশচন্দ্রের কমলের সঙ্গে যদি শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীর শুভ-বিবাহ সংঘটিত হয় এবং তদুপলক্ষে যতীন্দ্র সিংহ মহাশয়ের চকার-ভর্তি সাহেব সঙ্গীত রচনা করেন, তবে মস্ত একটা সামাজিক সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। এই উপায়ে প্রবীণ নবীন সমস্ত বড় বড় লেখকদের রচনা অদল বদল করিয়া ছাঁটিয়া তালি দিয়া নির্দোষ চিরস্থায়ী সাহিত্যে পরিণত করা যাইতে পারে।

আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য— ভবিষ্যতের জন্য আদর্শ নির্দেশ। এই আদর্শ এমন হওয়া চাই যাতে আর্ট ও সমাজ দু-ই বজায় থাকে।

আর্ট কি? এক কথায় বলা যাইতে পারে— যা ভাল লাগে তাই আর্টের অঙ্গ বা রস-বস্তু, এবং তা ভদ্র-জনের মুখরোচক করিয়া পরিবেশন করাই আর্ট। অবশ্য একই বস্তু সকলের ভাল না লাগিতে পারে, অতএব আর্টের সৃষ্টি ও উপভোগ কতকটা ব্যক্তিগত। কিন্তু এমন জিনিস অনেক আছে যা অনেকেরই ভাল লাগে কেবল মাত্রার তারতম্য লইয়াই বিবাদ। সকলেই বলে— দুধ অতি উপাদেয় বস্তু, কিন্তু কেউ ঢক্‌ঢক্‌ করিয়া খায়, কেউ একটু-আধটু খায়। পেঁয়াজের দুর্গন্ধ প্রসিদ্ধ, মাত্রা-ভেদে ভদ্র-অভদ্র অনেকেরই রুচিকর। অতএব দুধ ও পেঁয়াজ দু-ই অপরিহার্য রসবস্তু। তথাপি, সমাজ মনে করে— দুধ যত খাওয়া যায় ততই বলবৃদ্ধি হয়, কিন্তু পেঁয়াজ বেশী মাত্রায় বিকট। তাই আমরা গতানুগতিক ভাবে দুধ-খোরকে বলি সাত্ত্বিক, পেঁয়াজ-খোরকে বলি নেড়ে। ইহা অন্ধ সমাজের কথা, আমাদের অন্তরের কথা নয়। দয়া দাক্ষিণ্য ভক্তি প্রীতির কথা শুনিতে আমাদের বেশ ভাল লাগে তা অবশ্য মানি; কিন্তু কেচ্ছা কেলেঙ্কারি, খুনোখুনি ব্যভিচার, নরমাংস নারীমাংস— এ সকলও উপযুক্ত অনুপানের সহিত কম উপভোগ্য নয়।

সর্বভুক্‌ পাঠক হাঁ করিয়া আছে, ওস্তাদ রসস্রষ্টা কাহাকেও

বঞ্চিত করিতে, কিছুই বাদ দিতে পারেন না। তিনি শান্ত করুণ রসের স্রোত বহাইবেন, আবার ষড়্‌রিপুর বিচিত্র খেলা দেখাইয়াও তাক্ লাগাইয়া দিবেন। কিন্তু নিন্দুকের মুখ বন্ধ করিবেন কোন্ উপায়ে? পূর্বাচার্যগণ তাহা দেখাইয়া গেছেন। ভারতচন্দ্র পায়সান্ন পরিবেশনের সঙ্গে কালীনামের গরম মশলা দিয়া শুঁট্‌কী মাছ চালাইয়াছিলেন। কিন্তু এ যুগে তাহা চলিবে না, কারণ উক্ত মাছের নূতনত্ব নাই, কালীনামেরও আর তেমন হজম করাইবার ক্ষমতা নাই। মনীষী রেনল্ড্‌স্ ও তাঁর ভারতীয় শিষ্যগণ উৎকৃষ্টতর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন,— তাঁরা যথাসাধ্য আর্টের কেরামতি করিয়া অবশেষে দেখাইয়াছেন ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়। ইহাই নিন্দুকের প্রকৃষ্ট প্রত্যুত্তর। এখন আর্টের সীমা আরো বর্ধিত হইয়াছে, প্রাচীন লেখকগণ যা স্বপ্নেও ভাবেন নাই এমন নব নব রসবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে,— আলকাতরা হইতে স্যাকারিন, বানরের অঙ্গে নব যৌবনের গ্রন্থি, ছাগলের মনের গোপন কোণে উদ্দাম প্রেমের আদিধারা। কিছুই বাদ দিবার দরকার নাই, যা কিছু ব্যাপার হইয়া থাকে বা ঘটিতে পারে তা-ই আর্টের গণ্ডিতে পড়ে। কিন্তু শেষ রক্ষা চাই। যত ইচ্ছা নরক মন্থন করিয়া রত্ন উদ্ধার কর, কিন্তু উপসংহারে সমস্ত পাপাত্মার নাক কাটিয়া দাও।

একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিব, কিন্তু প্লট মনে আসিতেছে না। অপরের প্লট যে আত্মসাৎ করিব তার জো নাই,— আজকালকার ছোকরারা অতি চালাক, রুশিয়া হইতে

চুরি করিলেও ধরিয়া ফেলিবে। অতএব ঋণ স্বীকার করিয়াই চন্দ্রশেখর হইতে দু-একটি চরিত্র লইব। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে মন্দ আঁকেন নাই, তবে প্রায়শ্চিত্তটা বেশী হইয়াছে,— আজকাল অত না হইলেও চলে। কিন্তু আধুনিক আর্টের ব্যাপ্তি না জানায় প্রতাপকে তিনি একবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রতাপের চরিত্র আমূল সংশোধিত করিয়া কিঞ্চিৎ নমুনা দেখাইতেছি।—

প্রতাপ রায় মরে নাই। ঘা সারিবামাত্র সে চন্দ্রশেখরের বাড়ি আসিয়া হাঁকিল— ভটচায, ও ভটচায।

চন্দ্রশেখর নামাবলী গায়ে খড়ম পায়ে আসিয়া বলিলেন— কে ও, প্রতাপ যে। বেশ সেরেচ বাবা?

প্রতাপ একটি তাড়ি-রঙের ধুতির উপর তাড়ির ভাঁড়ের রঙের মেরজাই পরিয়া আসিয়াছে। তার চোখ লাল, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। টলিতে টলিতে বলিল— শৈবলিনীকে ডেকে দিন।

চন্দ্রশেখর মাথা নীচু করিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন— নাই বা দেখা করলে।

— দেখা করতে আমি আসি নি, একবারে নিয়ে যেতে এসেচি। ডাকুন শীগ্‌গির।

— সে কি প্রতাপ? তিনি যে কুল-বধূ।

— হলেনই বা, এক কুল ছেড়ে অন্য কুলে যাবেন, আমি তো আর লরেন্স ফস্টর নই। সব ঠিক করেচি, তোকি খাঁ প্রস্তুত, আজই শৈবলিনীকে মোছলমান বানিয়ে দেবে,— তার

পর আপনাকে তাল্লাক, আমার সঙ্গে নিকে। আমার নাম এখন আফ্‌তাব খাঁ। ভয় নেই ঠাকুর, জাত যাবে না, কালই আবার রামানন্দ স্বামীকে ধরে দুজনে শুদ্ধি নিয়ে নেব।

চন্দ্রশেখর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন— তুমি কি জাল-প্রতাপ?

প্রতাপ বজ্র-নিনাদে বলিল— আমি জাল! মূর্খ ব্রাহ্মণ, কাহার সম্পত্তি তুমি ভোগ করিতে চাও? এক বৃন্তে দুটি ফুল, কে ছিঁড়িয়াছিল? (মূল গ্রন্থ দেখ) ভণ্ড জ্যোতিষি, শৈবলিনীর অন্তরের কথা বিবাহের পূর্বে গণিয়া দেখ নাই?

চন্দ্রশেখর কাতর কণ্ঠে কহিলেন— খুবই অন্যায় হয়ে গেছে বাবা। স্ত্রী-চরিত্র তো জ্যোতিষে গণা যায় না। এই কলিকালে যে বিবাহের পূর্বে প্রেম হতে পারে তা জানতুমই না। যেতে দাও বাবা, যেতে দাও— যা হবার হয়ে গেছে। বেচারী এখন শান্তিতে আছে, সংসারধর্ম করচে, পুরানো কথা সব ভুলেচে। আহা, আর তাকে উদ্‌ব্যস্ত করো না।

প্রতাপ উন্মত্তের ন্যায় হাসিয়া বলিল— এই বিদ্যে নিয়ে তুমি পণ্ডিতি কর? যে অন্তরে অন্তরে আমারই, তাকে তুমি কোন্ অধিকারে আটকে রাখবে? বল ব্রাহ্মণ, বল বল। যে আমার শৈশব-সঙ্গিনী, সে আজু কাঁহা মেরী হৃদয়কী-ঈ-ঈ— (স্টার থিয়েটার দেখ)

চন্দ্রশেখর ভীত হইয়া বলিলেন— একটু ঠাণ্ডা হও বাবা। আমি বুঝিয়ে দিচ্চি।— পাপের স্পর্শ হতে কেউ রক্ষা পায় না,

শৈবলিনীও ছেলেবেলায় পাপে পড়েছিলেন—

— অ্যাঁ! পূর্বরাগ পাপ?

— সর্বত্র পাপ নয় বাবা। কিন্তু যেখানে স্বাধীন বিবাহ চলিত নেই, সেখানে পূর্বরাগের ফলে পরে শান্তিভঙ্গ হতে পারে, সেজন্যই পাপ।

— তবে পাপীয়সাকে ছেড়ে দাও না ঠাকুর।

— খাপ্‌পা হয়ো না বাবা। পাপ হলই বা— ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনি,— অমন একটু-আধটু পাপ আমরা সবাই করে থাকি। কিন্তু সেটা নির্মূল করাও যায়। শৈবলিনী মন্ত্রলাভ করেচেন, যে মন্ত্রবলে চিরপ্রবাহিত নদী অন্য খাতে চালানো যায়। (মূল গ্রন্থ দেখ)

— বুঝেচি বুঝেচি, বুজরুকি করে তাকে আটকে রাখতে চান! ও চলবে না ঠাকুর, তুমি তাকে আটকাবার কে? আমার শৈবলিনীকে চাই, এক্ষুনি এক্ষুনি। উচাটন মন যারে ধরিবারে ধায়, তারে কেন-ক্যানও-কেন নাহি পায়! (স্টার থিয়েটার দেখ)

চন্দ্রশেখর খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিলেন— ক্যানও নাহি পায় তা আমি বুঝিয়ে দিচ্চি। রামচরণ অ রামচরণ—

রামচরণ এখন ভটচায-বাড়িতেই কাজ করে। সাড়া দিল — আজ্ঞে।

— ওরে নিয়ে আয় তো আমার ছড়িটা, সেই বেতের লিক্‌লিকে ছড়ি। বাঁশের লাঠিটা নয়, বুঝেচিস্?

প্রতাপ বলিল— ছড়ি কি হবে, ভটচায ?

— তোমায় লাগাব। দু-এক ঘা খেলেই বুদ্ধি সাফ হয়ে যাবে। রামচরণ, জল্‌দি—

প্রতাপ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল— অ্যাঁ, মার্‌বে ? প্রতাপ রায়ের গায়ে হাত ? তবে রে পাজী, শুয়ার—

— অ রামচরণ, বেতের ছড়িতে হবে না রে, বাঁশের লাঠিটাই আন্‌—

প্রতাপ সদর্পে পলায়ন করিল। আর্ট ও সমাজধর্ম দু-ই বজায় রহিল, অথচ লাঠি ভাঙিল না।

১৮৪৯

তামাক ও বড় তামাক

মানুষ ও জন্তুর মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, মানুষ নেশা করিতে শিখিয়াছে, জন্তু শেখে নাই। বিড়াল দুধ মাছ খায়, অভাবে পড়িলে হাঁড়ি খায়, ঔষধার্থে ঘাস খায়, কিন্তু তাকে তামাকের পাতা বা গাঁজার জটা চিবাইতে কেউ দেখে নাই। মানুষ অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করে, ঘর-সংসার পাতে, জীবন-ধারণের জন্য যা-কিছু আবশ্যক সমস্তই সাধ্যমত সংগ্রহ করে, কিন্তু এতেই তার তৃপ্তি হয় না— সে একটু নেশাও চায়। অবশ্য, গম্ভীর-প্রকৃতি হিসাবী লোকের কথা আলাদা। তাঁদের কাছে নেশা মাত্রই অনাবশ্যক ; কারণ, তাতে দেহের পুষ্টি হয় না, জ্ঞানেরও বৃদ্ধি হয় না, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে অপকারই হয়। তথাপি বহু লোক কোনও অজ্ঞাত অভাব মিটাইবার জন্য নেশার শরণাপন্ন হয়।

নেশা বহু প্রকার, যথা তামাক গাঁজা মদ সঙ্গীত কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি। সকলগুলির চর্চার স্থান এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় নাই, সুতরাং তামাক ও গাঁজা সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

তামাক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিন্দুক জুটিয়াছে। তামাক খাইলে ক্ষুধা নষ্ট হয়, বুদ্ধি জড় হয়, হৃৎপিণ্ড দূষিত হয়, ইত্যাদি। কিন্তু কে গ্রাহ্য করে? জগতের আবাল-বৃদ্ধ তামাকের সেবক, বনিতারাও হইয়া উঠিতেছেন। তামাকের

বিরুদ্ধে যে-সব ভীষণ অভিযোগ শোনা যায়, তামাক-খোর তার খণ্ডনের কোন প্রয়াসই করে না, শুধু একটু হাসে ও নির্বিকার-চিত্তে টানে। কিন্তু তাদের অন্তরে যে জবাব অস্ফুট হইয়া আছে, আমরা তার কতকটা আন্দাজ করিতে পারি।-- মশায়, তামাক জিনিসটা স্বাস্থ্যের অনুকূল না হইতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যই কি সব চেয়ে বড়? একটু না হয় ক্ষুধা কমিল, চেহারায় পাক ধরিল, হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করিল,— কিন্তু আনন্দটা কি কিছুই নয়? মোটের উপর লাভটাই আমাদের বেশী। লোকসানের মাত্রা যদি বেশী হইত, তবে আপনিই আমরা ছাড়িয়া দিতাম, উপদেশের অপেক্ষা রাখিতাম না। আমাদের শরীর মন বেশ ভালই আছে, ভদ্র-সমাজে কেউ আমাদের অবজ্ঞা করে না। হাঁ, কোন কোন অর্বাচীনের তামাক খাইলে মাথা ঘোরে তা মানি; কিন্তু দু-এক জনের দুর্বলতার জন্য আমরা এত লোক কেন এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইব?

এই সময় গঞ্জিকাসেবীর বাজখাঁই গলার আওয়াজ শোনা গেল— ভায়া, আমরাও আছি। আমাদের তরফেও কিছু বল।

তামাক-খোর ধমক দিয়া বলেন— দূর হ লক্ষ্মীছাড়া গেঁজেল! তোদের সঙ্গে আমাদের তুলনা?

গাঁজা-খোর ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন— সে কি দাদা? তোমাতে আমাতে তো কেবল মাত্রার তফাত। তুমি খাও তামাক, আমি খাই বড়-তামাক। তোমরা শৌখিন বড়লোক, তাই বিস্তর আড়ম্বর,— রুপার ফরসি, জরিদার সটকা, সোনার সিগারেট-

কেস, কলের চকমকি। আমরা গরীব, তাই তুচ্ছ সরঞ্জামের বড়-বড় নাম রাখিয়াই শখ মিটাই। গাঁজা কাটিবার ছুরিকে বলি রতন-কাটারি, কাঠের পিঁড়িকে বলি প্রেম-তক্তি, ধোঁয়া ছাঁকিবার ভিজা ন্যাতাকে বলি জামিয়ার, গাঁজা ডলিবার সময় মন্ত্র বলি— বোম্ শঙ্কর কঙ্কড় কি ভোলা! আমাদের নেশার আয়োজনেই কত কাব্য-রস,— তোমরা তো পরের প্রস্তুত জিনিস টানিয়াই খালাস। আর, আনন্দের কথা যদি ধর, তবে তোমরা বহু পশ্চাতে। ত্বরিতানন্দ জান? আমরা তাই উপভোগ করি। স্বাস্থ্য? তার জবাব তো তোমরা নিজেরাই দিয়াছ। আমরা স্বাস্থ্যের উপর একটু বেশী অত্যাচার করি বটে, কিন্তু আনন্দটি কেমন? না হয় গলাটা একটু কর্কশ হইল, চোখ একটু লাল হইল, চেহারাটা একটু চোয়াড়ে হইল, কিন্তু মোটের উপর শরীর মন ঠিকই আছে।

হিসাবী সমাজহিতৈষী দুই তরফের কথা শুনিয়া বলিলেন— তোমাদের বচসা মিটানো বড়ই শক্ত কাজ। আমি বলি কি— তোমরা দু দলই বদ অভ্যাস ত্যাগ কর। শরবত খাও, ভাল ভাল জিনিস খাও— যাতে গায়ে গত্তি লাগে, যথা লুচি-মণ্ডা। প্রকৃত আনন্দ তাতেই আছে।

তামাক-খোর বলিলেন— শরবত খুব স্নিগ্ধ, লুচি-মণ্ডাও খুব পুষ্টিকর, সুবিধা পাইলেই আমরা তা খাই। কিন্তু এ সব জিনিসে আত্মা তৃপ্ত হয় না, আড্ডা জমে না। কিঞ্চিৎ নেশার চর্চা না করিলে মানুষে মানুষে ভাবের বিনিময় অসম্ভব। তামাক অবশ্য

চাই, এইটিই নিরীহ প্রকাশ্য নেশা, আর সব নেশা অপ্রকাশ্য।

গাঁজা-খোর বলিলেন— ঠিক কথা। নেশা চাই বই কি, কিন্তু গাঁজাই পরাকাষ্ঠা। তোমাদের পাঁচ জনের উৎসাহ পাইলেই আমরা ভদ্র-সমাজে চালাইয়া দিতে পারি।

সমাজহিতৈষী চিন্তিত হইয়া বলিলেন— তাই তো. বড় মুস্কিলের কথা। দেখিতেছি তোমরা কেউ-ই ধোঁয়া না টানিলে বাঁচিবে না। আচ্ছা, অক্সিজেন শুঁকিলে চলে না ?

তামাক-খোর গাঁজা-খোর অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সমস্বরে কহিলেন— আজ্ঞে, ওটা অন্তিম কালে, হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে। আপাতত কিছু সাকার সুগন্ধি সুস্বাদ মনোহারী ধোঁয়ার ফরমাশ করুন।

হিতৈষী নাচার হইয়া বলিলেন— তবে ঐ তামাক অবধি বরাদ্দ রহিল। তার উপর আর উঠিও না, ঐখানেই গণ্ডি টানিলাম।

গাঁজা-খোর অট্টহাস্যে বলিলেন— খুব বুদ্ধি আপনার! নেশার তত্ত্ব আপনি কিছুই বোঝেন না। ঐ তামাকই তো একটু একটু করিয়া বেমালুম ভাবে গাঁজায় পরিণত হইয়াছে— তামাক-তামা-তাজা-গাঁজা। 'মৌচাক'এর শিশু পাঠকরাও এই তত্ত্ব জানে। কোথায় গণ্ডি টানিবেন ?

সমাজহিতৈষী মহাশয় হতাশ হইয়া বলিলেন— তবে মর তোমরা পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা। দিন কতক যাক, তার পর বুঝিব কার পরমায়ু কত কাল।

১৮৪৯